অপরাজিতা

শারদ সংকলন ♦ ষষ্ঠ সংখ্যা ♦ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
Tejgaon Sanatan Samaj Unnayan Parishad

BBS
...excel your expectation

BANGLADESH BUILDING SYSTEMS LTD.

(Pre-Engineered Steel Building Manufacturer)

Pre-Engineered Steel Building Manufacturer

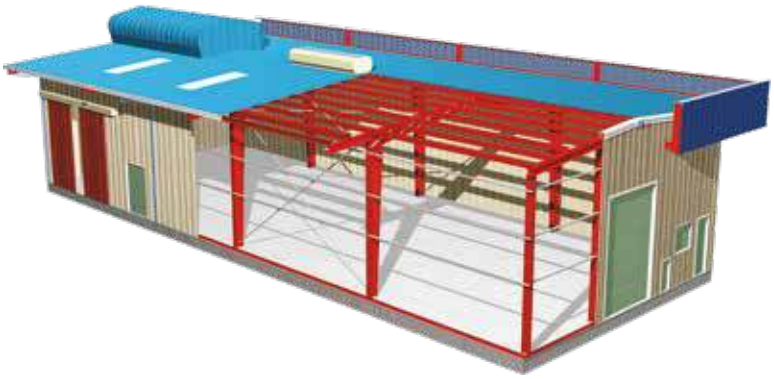

Looking forward to providing service for your next Steel building

Our Specialities

- Factories
- Warehouses
- Hall rooms
- Workshops
- Aircraft Hangers
- Office Buildings
- Showrooms
- Pharmaceutical Industry
- Distribution Centers
- Supermarkets
- Restaurants
- Residential Buildings
- Filling Station
- Light Rooftop Sheds
- Textile Industry

We Provide

- After sales service
- Wide range of design & color
- Architectural support
- Trouble free construction
- Accurate Structure

We Provide

- Wide span
- Low cost
- High quality
- Expandability
- Relocatable
- Quick delivery
- Flexibility in design
- Low maintenance
- Long building life

Head Office:
Configure Bepari Tower (3rd Floor), Ga-64, Middle Badda, Progati Swarani, Dhaka 1212.
+88 02 222294771, 222295915 (Tel); +88 02 222260772 (Fax) | E-mail: info@bbspeb.com

Chattogram Office:
Kader Tower (6th Floor), Room-11, 128 Jubilee Road, Chattogram, Tel: +88 031 2864648

Factory:
Jaina Bazar, Telehate, Sreepur, Gazipur, Bangladesh. | Tel/Fax: +88 0682 55505

www.bbspeb.com

অপরাজিতা

শারদ সংকলন, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
Tejgaon Sanatan Samaj Unnayan Parishad

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
Tejgaon Sanatan Samaj Unnayan Parishad

শারদ দুর্গোৎসব ২০২২

সম্পাদক
ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশ আদিত্য
অসীম কুমার দাশ
কেশব সেন
প্রদীপ কুমার সাহা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
প্রদীপ কুমার সাহা, সভাপতি
সুখলাল নন্দী, সাধারণ সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

সার্বিক সহযোগিতায়
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইন
প্রদীপ কুমার সাহা

প্রকাশনায়
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

মুদ্রণে
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০
Mob: 01715-596421, E-mail: shabdakoli70@gmail.com

অপরাজিতা

শারদ সংকলন ♦ ষষ্ঠ সংখ্যা ♦ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী ৪-২৩
সম্পাদকীয় ২৪
জয় মা দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী ২৭
দুর্গোৎসব-এর এক অনন্য স্বীকৃতি ২৯
শারদীয় দুর্গাপূজা : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরন্তন উৎসব ৩০
মায়ের আগমনী বার্তা ও সংগীত ৩৩
দেবী দুর্গার আবাহনের তাৎপর্য ৩৬
বিজয়ী দশমী : তত্ত্ব ও তাৎপর্য ৩৮
শারদীয় দুর্গাপূজা ও তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির ৪১
শৈশবের দুর্গাপূজার স্মৃতি ৪৫
কুমারী পূজা কি? কেন করা হয় ৪৯
শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ইতিকথা ৫০
চৈতন্য মহাপ্রভুর আর্বিভাব ৫৩
কলিযুগই শ্রেষ্ঠ ৫৭
যুগধর্ম ৫৯
একজন রত্নাগর্ভা মায়ের কথা ৬৪
৬৬ কু-সন্তান
৬৭ পবিত্র বেদ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান
৬৯ রাধামাধবের লীলা ভূমি বৃন্দাবন
৭১ উপাসনা ও সঙ্গীত
৭৩ পুজায় সংসারের কর্তা মহাদেবের ভাবনা
৭৬ বিপদ এবং পাপ থেকে মুক্তি লাভ
৮১ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : ধর্মচিন্তা
৮৪ বামাখ্যাপা ও আগন্তুক
৮৬ জগদ্ধাত্রী
৮৬ অর্থহীন জীবন, তোমাকে পুঁজিবে
৮৭ আমার মধ্যবিত্ত
৮৭ দুর্গা
৮৭ শিক্ষকের মর্যাদা
৮৮ আমাদের জন্য তিনি
৮৮ বিশ্বময়ী
১০৫ সনাতন ধর্মে বর্ণ ও শ্রাদ্ধ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২০ আশ্বিন ১৪২৯
০৫ অক্টোবর ২০২২

বাণী

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার সাথে মিশে আছে চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আবহমানকাল ধরে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদযাপন করে আসছে। দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক উৎসবও। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী একত্রিত হন, মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। তাই এ উৎসব সার্বজনীন। এ সার্বজনীনতা প্রমাণ করে, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা দেশের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য-সুন্দরের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠুক; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরো সুসংহত হোক– এ কামনা করি।

মানবতা সকল ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে রাখে, দেখায় মুক্তির পথ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। করোনা মহামারির ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি। এর ফলে নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ নানা সীমাবদ্ধতার মাঝে দিনাতিপাত করছে। আমি সমাজের দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। শারদীয় দুর্গোৎসবের আনন্দে সকলেই যাতে শামিল হতে পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে উদ্বুদ্ধ করুক, বিশ্ব মানবতার জয় হোক–এ প্রত্যাশা করি।

শারদীয় দুর্গোৎসব সফল হোক।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ আশ্বিন ১৪২৯
০১ অক্টোবর ২০২২

বাণী

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দুর্গা পূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি এখন সার্বজনীন উৎসব। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' - এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশে আমরা সব ধর্মীয় উৎসব একসঙ্গে পালন করি। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সকলে মিলে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। এই দেশ আমাদের সকলের। বাংলাদেশ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার উন্নয়ন করে যাচ্ছে। সব ধর্মের মানুষ সমভাবে উন্নয়নের সুফল উপভোগ করছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং জনগণকে সকল সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। আমাদের সকলকে একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। আমি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপনের অনুরোধ জানাই।

আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২

বাণী

শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও "অপরাজিতা" নামে স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানব জাতিসহ সকল জীবের কল্যাণ কামনায় সনাতন ধর্মের লোকজন সম্মিলিতভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন করে থাকে। অশুভ শক্তির বিনাশ ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয় শারদীয় দুর্গাপূজা। শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব নয়। এটি আজ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। শারদীয় দুর্গোৎসবের এ আনন্দঘন মুহূর্তে আমি হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

দুর্গাপূজা বাঙালি চেতনার মানসপটে এক সংহতির প্রতীক। মা দুর্গার আগমনী বার্তায় সকলের প্রাণে ধ্বনিত হচ্ছে মঙ্গলবার্তা। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গাপূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজা এই শাশ্বত মন্ত্রে ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছে।

হাজার বছর ধরে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারিরা এদেশে পারস্পারিক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে বসবাস ও ধর্মচর্চা করে আসছে। সমকালীন বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন বাংলাদেশ। প্রতিবছর দেশে শারদীয় দূর্গোৎসবসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারিদের সকল উৎসব যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। শেখ হাসিনা সরকার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে পূজা উদ্‌যাপনে সহযোগিতা করে আসছে। এ উৎসব সকলের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন আরো সুদৃঢ় করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি এবং স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ওবায়দুল কাদের, এমপি)

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ ষষ্ঠবারের মত এবছরও 'অপরাজিতা' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ দেশের সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাই এই উৎসবের মূল চেতনা। বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ হিসেবে এখানে সব ধর্মের মর্মবাণী প্রতিফলিত হয়। আমাদের দেশের জনগণ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। তাই বিভিন্ন ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের সময় গোটা দেশ যেন আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বিশ্বে উজ্জ্বল পরিচিত হয়ে আছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার ব্যবস্থা করেছে। এ ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে বলে আমি মনে করি।

আমি তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের 'অপরাজিতা' স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খান, এমপি)

মন্ত্রী
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ একটি অরাজনৈতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি তেজগাঁও এলাকার সকল জনগণের সহযোগিতায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিনিয়ত পালন করে যাচ্ছে। এ পরিষদ ষষ্ঠবারের মত শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা আয়োজন করায় পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ষষ্ঠবারের মত "অপরাজিতা" শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হবে জেনে আমি আনন্দিত। যাঁদের শ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় এ স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা ।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জীবের মঙ্গলার্থে যুগ যুগ ধরে বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা ধর্মীয় উপাচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পালন করে থাকে শারদীয় দুর্গাপূজা। এ দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'-এ চেতনাকে ধারণ করে ধর্মান্ধতার উর্ধ্বে উঠে সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে দুর্গোৎসব পালন করে থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা।

মানবতাই ধর্মের মূল বাণী। ধর্ম মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে রাখে। তাই ধর্মের সকল অনুশাসন সঠিকভাবে মেনে চলার পাশাপাশি মানবজাতিকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। অসহায় ও দরিদ্র মানুষের আপদকালীন সময়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। বাঙালি জাতির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো চিরকালীন ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যকে লালন করে এগিয়ে নিতে হবে সামগ্রিক অগ্রযাত্রাকে। বাঙালি সংস্কৃতিতে বিদ্যমান অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সকলের মাঝে ঐক্য ও সম্প্রীতি এ দেশকে গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করুক- এ প্রত্যাশা করি।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সফল প্রচেষ্ঠায় আজ বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে সারাবিশ্বে সুপরিচিতি লাভ করেছে। অশুভ শক্তির বিনাশ ও মানুষকে সত্য ও ন্যায় পথে চলার চেতনায় উজ্জীবিত করে দেশকে আরো সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে এ দেশ হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

সবশেষে আবারও শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকলের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইনাম সুজন, এমপি

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ ষষ্ঠবারের মত শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত এবং এ উপলক্ষ্যে "অপরাজিতা" শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। যাঁদের শ্রম ও প্রচেষ্ঠায় এ স্মরণিকাটি প্রকাশিত হবে আমি তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এখন আসছে প্রকৃতির সেই শরৎকাল। আর এই শরতেই শুরু শারদোৎসব। শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দুদের প্রধান উৎসব। শক্তি, কল্যাণ, শান্তি, শ্রী ও সমৃদ্ধি কামনা পূজিতা দেবীর সৃষ্টির কারণ স্বরূপ। মহিষাসুর বধের জন্য দেবতাদের প্রার্থনায় ও সম্মিলিত তেজে মা দুর্গা আবির্ভূত হয়ে মহিষাসুরকে বধ করে। দেবকুল মাতৃরূপে দেবী দুর্গাকে বন্দনা করেন।

পৃথিবীর সর্বত্র আজ মহিষাসুর নামক দানব বিচরণ করছে। তাই মা দুর্গার কাছে বিনীত প্রার্থনা, এই অশুভ শক্তির বিনাশ করে দেশ ও পৃথিবীর মঙ্গল বয়ে আসুক। মা দুর্গার কাছে আরো প্রার্থনা দেশ, বিশ্ব, সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা, বর্বরতা দূর হোক। মানুষের মন থেকে দূর হোক লালসা, লোভ আর হিংসা।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দঘন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশকে করেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু একটি মহল এ সম্প্রীতি নষ্ট করে দেশে অস্থিরতার দাবানল ছড়িতে দিতে তৎপরতা চালায় কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তা সফল হতে পারে না। এ বিষয়ে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজার সময় মণ্ডপের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করতে হবে। যাতে কোন দুষ্কৃতিকারী উৎসবের শান্তি বিনষ্ট না করতে পারে।

মানব জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় দুর্গোৎসব পালিত হয়। এ উৎসব শুধু ধর্মীয় উৎসব নয় যা সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের জনগণ মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। তাই এ উৎসব সর্বজনীন। এ সর্বজনীন উৎসব বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। যার ফলে দেশের সকল ধর্মের নাগরিকের মাঝে পারস্পারিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধন আরো সুসংহত হউক-এ প্রত্যাশা করি।

সবাইকে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি)

মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

বাণী

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ষষ্ঠবারের মত "তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ" শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে ও "অপরাজিতা" শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত। এ স্মরণিকা যাদের শ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

অশুভ শক্তিকে বিনাশ করা এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার আরাধনা করা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে দুর্গাপূজা আজ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের হানাহানি রোধ, শান্তি, সমৃদ্ধিসহ সকল জীবের কল্যাণ কামনায় বাঙালির অন্যতম উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, কারণ এই উৎসব হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করে আসছে।

ধর্ম মানুষের মানসিক ও আত্মিক গুণাবলী বিকাশিত করে, শিক্ষা দেয় সংযম, ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পারিক সৌহার্দ্যের। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন ও সম্প্রদায় আনন্দঘন পরিবেশে ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে। এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শারদীয় দুর্গোৎসব সবার মধ্যে সামাজিক বন্ধন, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতাকে আরো সুদৃঢ় করুক এ প্রত্যাশা রইল।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবাইকে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা। শারদীয় দুর্গোৎসব সকলের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনুক।

(মোঃ আতিকুল ইসলাম)

بسم الله الرحمن الرحيم

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ-এর উদ্যোগে 'অপরাজিতা' শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি শারদীয় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমান কাল থেকে এদেশে সকল ধর্মের মানুষ মুক্ত পরিবেশে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি নির্বিঘ্নে প্রতিপালন করে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার।' হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দেশের পূজামণ্ডপসমূহে আর্থিক সহায়তাসহ সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করছে।

আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়সহ সকলের আনন্দময় জীবন, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। শারদীয় দুর্গোৎসব সবার মধ্যে সামাজিক বন্ধন, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতাকে আরো সুদৃঢ় করুক-এ প্রত্যাশা রইল। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে 'অপরাজিতা' নামে স্মরণিকা প্রকাশসহ তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ-এর সকল উদ্যোগের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মো: ফরিদুল হক খান, এমপি)

ভাইস-চেয়ারম্যান
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ ষষ্ঠবারের মত "শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা" আয়োজন করায় পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ষষ্ঠবারের মত "অপরাজিতা" শিরোনামে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গোপূজা বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। পুরাণ মতে, অসুরের অত্যাচারে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, তখন সব দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র তুলে দিলেন মা দুর্গাকে। দেবতাদের প্রার্থনায় ও সম্মিলিত তেজে মা দুর্গা আবির্ভূত হয়ে মহিষাসুরকে বধ করে। দেবকুল হয় অসুর মুক্ত। জয় হয় দেবকুলের। দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। দেবী দুর্গা মানবজাতির সকল অন্যায়,অত্যাচার ও অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য মনুষ্যকুলে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। প্রতি বছর শরৎকালে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দেবী দুর্গার পূজা-অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে যুগের পর যুগ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকজন আনন্দঘন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছে। সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বিবেচিত। "ধর্ম যার যার উৎসব সবার" এ শ্লোগানকে সম্মান প্রদর্শন করে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ মহিষাসুর নামক দানবদের বিচরণ বিদ্যমান। তাই মা দুর্গার কাছে আরাধনা, এ অশুভ শক্তির বিনাশ করে মঙ্গল বয়ে আসুক। আরো প্রার্থনা দেশ, বিশ্ব, সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা ও বর্বরতা দূর হোক। মানুষের মন থেকে দূর হোক লোভ, লালসা ও প্রতিহিংসা। এতে করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে উঠবে-এ প্রত্যাশা করি।

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকলের শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সুব্রত পাল)

অধ্যক্ষ ও সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা
৬ অক্টোবর ২০২২

আশীর্বাণী

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ 'অপরাজিতা' শীর্ষক স্মরণিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ করছে জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

সাধনার উদ্দেশ্য হলো আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন। যদিও ঈশ্বরীয় সাধনার প্রথম স্তরে আমরা অনুভব করি যে, ঈশ্বর আমাদের থেকে আলাদা। সাধনার অগ্রগতিতে দ্বিতীয় স্তরে অনুভব করি যে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সাধনার সর্বোচ্চ অবস্থায় সাধকের উপলব্ধি হয় যে, ঈশ্বর ভিন্ন তাঁর নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব নেই। একমাত্র ঈশ্বরই বিদ্যমান আছেন। সেখানে সাধকের সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে। সাধকের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব বিলয় প্রাপ্ত হয়। তিনি জগতের সমস্ত শক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন।

আসন্ন দুর্গাপূজায় শক্তিরূপিনী জগজ্জননীর নিকট আমাদের অন্তরের প্রার্থনা, তিনি যেন সকলকে শান্তি ও আনন্দ প্রদান করেন। আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের নাশ করেন এবং আমাদের মধ্যস্থিত অনন্ত শক্তির জাগরণ ঘটান।

স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সতত শুভানুধ্যায়ী

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

সভাপতি
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি

বাণী

জগৎ জননী মা দুর্গার আগমনে আনন্দ মুখরিত বিশ্বচরাচর। শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা সার্বজনীন রূপ নিয়ে প্রতিবছর আমাদের মাঝে আগমন করে এবং সবর্স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উদযাপিত হয়।

দুর্গাপূজা সনাতন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও এর ব্যাপ্তি সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে সময়ের পরিক্রমায় সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে।

'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এই শ্লোগন ধারণ করে এখন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উৎসবে পরিণত হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজা।

পৃথিবী কখনও আসুরিক শক্তির কাছে পরাভূত হয়নি, মাথানত করেনি। আমরা মাতৃপূজার মাধ্যমে আমাদের অন্তরের ও বাহিরের আসুরিক শক্তিকে অবশ্যই পরাজিত করে সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করব।

ধর্ম মানুষকে ন্যায় পথে চলার আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্যকে বিতারিত করে, মানবতার প্রতি আকৃষ্ট করে। তাই ধর্মীয় বিধান যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসতে হবে। বাঙালি জাতির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যকে অটুট রেখে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রা। পারস্পারিক ঐক্য ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সকলকে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করছি। শারদীয় দুর্গোৎসব সফল হউক এ কামনা করছি।

জে. এল. ভৌমিক

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি

শুভেচ্ছা বাণী

বাঙালি সনাতন সম্প্রদায়ের প্রধানতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গাপূজা। আদ্যাশক্তি মহামায়া শ্রীশ্রী দুর্গা মায়ের পাঁচদিন ব্যাপী পূজা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে স্বাত্ত্বিকভাবে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে।

শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবের সার্বজনীনতা অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শরতের এই উৎসবে সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আন্ত-ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে ইস্পাতসম দৃঢ় করে। কর্মময় সমাজ জীবনে সকল ধর্মের মানুষের পারস্পরিক উৎসবে অংশগ্রহণ অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনাকে দৃঢ় এবং পরিশীলিত করে।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসূত অপশক্তি মাঝে মাঝে সনাতন সম্প্রদায়সহ অপরাপর ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর হামলা, নির্যাতন-নিপীড়ন এর মাধ্যমে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ম্লান করে দিচ্ছে। এই অপশক্তিকে রুখে দাঁড়াতে না পারলে বঙ্গবন্ধুর আকাঙ্খিত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাকে এগিয়ে নেয়া অসম্ভব হবে।

দশভূজা দেবী দুর্গা অশুর শক্তিকে বিনাশ করে, শুভ শক্তির জয়ের মধ্যে দিয়ে ধরণীকে রক্ষা করেন। আমরাও মায়ের আরাধনা করি আমাদের ভিতরের ও সমাজের পাশবিক শক্তিকে পরাভূত করে শুভ শক্তির জয়ের জন্য।

মানবসভ্যতা কখনো অপশক্তির কাছে হার মানেনি। তাই এবারের পূজোয় দেবী দুর্গার কাছে আমাদের প্রার্থনা থাকবে বিশ্ব যেন দ্রুত করোনামুক্ত হয় এবং আসুরিক শক্তিকে দমনে মা যেন আমাদের শক্তি ও সাহস দেন। বিশ্ব যেন হয় প্রকৃতপক্ষে মানুষসহ সকলের প্রাণের প্রকৃত আবাসযোগ্য বাসস্থান।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাইকে জানাই শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সকল মানুষের কল্যাণ হোক, মানবতার জয় হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার

সভাপতি
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি

শুভেচ্ছা বাণী

সমগ্রবিশ্ব যখন মনুষ্যসৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দা ও মানবিক সংকটে নিপতিত এবং সংঘটিত ঘটনাবলী তাঁকেই ভাবিত করে তুলেছে, তেমন দুঃসহ একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তারপরও আমরা বলতে পারি শারদীয় দুর্গোৎসব কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের নয়, এখন তা সার্বজনীন উৎসব। এ উৎসবের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা হিন্দু সম্প্রদায়ের, কিন্তু মূলবাণী সমগ্র মানবজাতির জন্য নিবেদিত। এ অঙ্গনে তাই সব মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার। মাতৃ আরাধনায় সবার নিমন্ত্রণ।

আগেই বলেছি, এক দুঃসহ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে মাতৃবন্দনার আয়োজন করা হয়েছে। বছরের গোড়া থেকেই পুরোবিশ্ব শুধু দিনযাপনের গ্লানিতে ক্লিষ্ট। সাধারণ মানুষ বুকের গভীর থেকে সুখের নিঃশ্বাসটুকু নিতে পারছে না। বছরজুড়ে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অগ্নিমূল্য মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। এক ধরনের অস্থিরতা, অসহায়তা গিলে খাচ্ছে সমগ্রজীবন।

কোন ধর্মই অন্যায়, অসত্য, অসুন্দরকে সমর্থন করে না। সব ধর্মই শাশ্বত সুন্দরকে প্রতিষ্ঠার জন্য আলোর পথ দেখায়। মানুষের মধ্যে মনুষত্বের উদ্বোধন ঘটায়। মানুষকে তার নিজের কালের জ্ঞান ও অনুভবের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, তার মধ্যে থেকেই লক্ষ ও সত্যকে আবিষ্কার করে নিতে হয় এবং এভাবেই মনুষ্যত্বের বিজয়সূচিত হতে পারে। প্রগতি ও সভ্যতা টিকে থাকতে পারে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক বন্ধন-এই শারদলগ্নে যখন উৎসবের বাঁশি বেজে ওঠে, তখন বুঝি তা আরো দৃঢ় হয়, হয় আরো অন্তরঙ্গ, প্রাণবন্ত। এ একধরনের সামাজিক অঙ্গীকার। এই সামাজিক অঙ্গীকারের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটতে আমরা দেবী দুর্গার আবাহন করি; দেবীর কাছে শান্তি চাই, শক্তি চাই। শান্তির জন্য শক্তির প্রয়োজন। এ শক্তি ধ্বংসাত্মক নয়। এ শক্তি সৃষ্টিশীল-নব নব অভিযোজনায় এগিয়ে চলার প্রমূর্ত প্রতিমা।

সব অশুভ শক্তিকে রুখে দিয়ে এক কল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা যেন প্রতিষ্ঠা করতে পারি- শারদ প্রাতে এই হোক আমাদের প্রার্থনা। আমরা যেন মাঙ্গলিক আলোয় ভরে দিতে পারি প্রতিটি গৃহকোণ; শিউলি ফুলের গন্ধমাখা সকালে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা। পৃথিবীতে কল্যাণবোধ জাগ্রত থাকুক।

মনীন্দ্র কুমার নাথ

সাধারণ সম্পাদক
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি

বাণী

বাঙালি হিন্দু সমাজের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজায় আমরা আবারো একত্রিত হয়েছি মাতৃবন্দনায়, যিনি আমাদেরকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি দেন, সাহস যোগান। নূতন করে শপথ নিই এক শান্তিপূর্ণ ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে।

ধর্ম পালনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মাঝে যুক্ত থাকা, দেবত্বকে জাগিয়ে তোলা, যা অন্যায় অসত্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে মানুষকে সত্য, সুন্দর ও ন্যায় বোধের চেতনায় অভিষিক্ত করে। ধর্মের শাশ্বত বাণী মানবতা। তবুও ধর্মের নামে হানাহানি, বিভেদ, অনৈক্য, অসুন্দর ও আসুরিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ শক্তির উত্থান মানবসভ্যতাকে বার বার আক্রান্ত করতে চায়। দেশে দেশে বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হতে হয়, মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়। আসুরিক শক্তি সাময়িকভাবে বিজয়ী হলেও শুভ শক্তির কাছে বারবার পরাভূত হয়ে মানবসভ্যতা আপন গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। দুর্গাপূজার চেতনার মাধ্যমে আমরা অন্তরের ও বাহিরের অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে সত্য-সুন্দরকেই প্রতিষ্ঠিত করব।

সময়ের ধারায় শারদীয় দুর্গাপূজা সর্বজনীন দুর্গোৎসবে পরিণত হলেও বিগত দুই বৎসর বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে আমাদেরকে ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে পূজা করতে পারলেও উৎসবের সর্বজনীন আঙ্গিক থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। করোনার প্রকোপ নিম্নমূখী হওয়ায় এবং সরকারী বিধিনিষেধের অনেক শর্ত তুলে নেয়ার ফলে এবারের শারদীয় দুর্গোৎসব সকলের অংশগ্রহণে আনন্দময় হয়ে উঠবে। আশা করি এবছর ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উৎসব হবে মহামিলনের কর্মযজ্ঞ। তবে গতবছরের দুর্গাপূজায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির ঘৃন্য কর্মকাণ্ডকে মাথায় রেখে মন্দির/মণ্ডপে যারা দায়িত্বে থাকবেন তাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। সকল পরিস্থিতি সাহসের সাথে মোকাবিলার জন্য মানসিকভাবেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

দশভূজা দেবী দুর্গা হিংসা, ঘৃণা, লোভ, স্বার্থপরতা, কুসংস্কারসহ সকল মন্দ শক্তিকে ধ্বংস করে যা কিছু শুভ তাকে রক্ষা করেন। তিনি অবশ্যই আমাদেরকে সকল অপশক্তির হাত থেকে সুরক্ষা দিবেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করার পাশাপাশি বিশ্বের সকল মানুষের জীবনে বয়ে আনুক শান্তি ও কল্যাণের বার্তা। প্রতিষ্ঠিত হোক মানবতার মহিমা। মায়ের আশীর্বাদ সবার ওপর বর্ষিত হোক।

সবাইকে শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা।

রমেন মণ্ডল

সভাপতি
তেজগাঁও থানা আওয়ামী লীগ

বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ ষষ্ঠবারের মত শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি এ সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করা এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আরাধনা করা। সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কিন্তু উৎসব সকলের। ফলে দুর্গাপূজা আজ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। সকলের নিকট এ পূজার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। বিশ্বের হানাহানি রোধ করে শান্তি ও সমৃদ্ধিসহ সকল জীবের কল্যাণ কামনায় বাঙালির অন্যতম উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, কারণ এ উৎসব হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারন ও লালন করে আসছে। বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গোৎসব সকল সম্প্রদায়ের লোকজন মিলে-মিশে একত্রিত হয়ে উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে।

ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের উচিৎ সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে পরম করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করা। শারদীয় দুর্গোৎসব সবার মধ্যে সামাজিক বন্ধন, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতাকে আরো সুদৃঢ় করুক এ প্রত্যাশা রইল।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে "অপরাজিতা" শীর্ষক স্মরণিকাটি যাঁদের শ্রম ও প্রচেষ্ঠায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাদেরকে প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তাঁদের এ মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সকল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জানাই শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(প্রফেসর মোঃ আবদুর রশীদ)
অধ্যক্ষ, তেজগাঁও কলেজ

কাউন্সিলর
২৬ নং ওয়ার্ড
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

শুভেচ্ছা

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ এমন একটি সংগঠন যা সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এলাকার সকলের পরামর্শ ও সহযোগিতায় ষষ্ঠবারের মত শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করায় পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ পূজা উপলক্ষ্যে ষষ্ঠবারের মত প্রকাশিত হতে যাচ্ছে "অপরাজিতা" শীর্ষক স্মরণিকা- এটি একটি মহৎ কাজ। যাঁদের নিরলস প্রচেষ্ঠায় এ স্মরণিকাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁদের সবার প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এ সংগঠনের উদ্যোগে ২৬ নং ওয়ার্ডে তেজকুনিপাড়া এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় উৎসবমুখর পরিবেশে প্রতি বছর শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করায় আমি গর্ববোধ করি এবং সকল প্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি।

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গাপূজা প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ দুর্গোৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। দুর্গাপূজা বাঙালি চেতনার মানসপটে এক ঐক্যের প্রতীক। বাংলাদেশে সকল ধর্মের লোকজন ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় দুর্গোৎসব পালন করে থাকে। তাই এ উৎসবকে সর্বজনীন বলে আখ্যায়িত করা হয়।

বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ। এদেশে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সকলের সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অংশগ্রহণে হয়ে উঠে উৎসবমুখর। এ বছরও শারদীয় দুর্গোৎসব সকলের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন আরো দৃঢ় করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। জয় হউক বিশ্বমানবতার। মা দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী মা আমাদের সকলের সহায় হউন।

আমি শারদীয় দুর্গাপূজার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকলের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

(শামীম হাসান)

সভাপতি
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

শুভেচ্ছা

দেশ ও জাতির সংহতি ও উন্নয়নের প্রতীক দুর্গাপূজার কাঠামোতে পরিলক্ষিত হয়। গণেশ সাফল্যের প্রতীক, কার্তিক বীরত্বের, লক্ষ্মী ধন-সম্পদের এবং সরস্বতী জ্ঞানের। আর দুর্গার দশটি হাতে দশটি প্রহরণ (অস্ত্র) অপরিমেয় বলবীর্যের প্রতীক। সিংহ বশ্যতার প্রতীক এবং মহিষাসুর সমস্ত অসুরের প্রতীক হিসেবে দুর্গাপূজার কাঠামোতে বিদ্যমান। একটি জাতি সকল অশুভ শক্তিকে পদদলিত করে পরিপূর্ণতা লাভ করে। দেবী দুর্গার পূজা-অর্চনাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনেও এই ধারণাই জাগ্রত হয়।

শারদীয় দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে দেশের সকল স্তরের সামাজিক জীবনকে অসহিষ্ণুতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করে মানুষের মধ্যে ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করে। বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। সকল বাঙালিকে এক মায়াবী বন্ধনে জড়িয়ে রাখে। অপরদিকে উদ্বুদ্ধ করে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে। সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করে। দুর্গোৎসব শুধুমাত্র বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নয়, এর চিরায়ত ঐকতান স্পর্শ করে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়কে। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে যে অনাবিল আনন্দ সবার মনের মাঝে জেগে ওঠে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির প্রতিটি গৃহকে আলোকিত করে সকলের মঙ্গল কামনায়।

ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় কয়েক হাজার সনাতন ধর্মের লোকজন বসবাস করেন। এ এলাকায় নিয়মিতভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার জন্য কোন স্থায়ী মন্দির ছিল না। অত্র এলাকায় বসবাসরত সনাতন ধর্মের লোকজন নিয়মিতভাবে পূজা-পার্বন পালন করতে পারছিলেন না। এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে অত্র এলাকার সাংসদ ও মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান এমপি, ২৬ নংওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব শামীম হাসান, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর জনাব শামীমা রহমানসহ অত্র এলাকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের সার্বিক সহযোগিতায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির'। স্থায়ীভাবে নির্মিত মন্দিরে নিয়মিতভাবে পূজা-অর্চনার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এ মন্দিরে প্রতিদিন শ্রীশ্রী দুর্গা মায়ের পূজা-অর্চনাসহ প্রতি শনিবার শনিপূজা, প্রতি শুক্রবার গীতা পাঠ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও লোকনাথ বাবার জন্মতিথিসহ অপরাপর পূজা-পার্বন যথাযোগ্য মর্যাদায় উৎসবমূখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ বিগত পাঁচ বছরের ন্যায় এ বছরও 'তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির'-এ শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এ পূজায় সার্বিক সহযোগিতার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, কাউন্সিলর মহোদয়গণ ও স্থানীয় সকল নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলী, কার্যকরী পরিষদ ও সকল সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্ঠায় শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে বলে আমি তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে অপরাজিতা শীর্ষক শিরোনামে স্মরণিকা। এ স্মরণিকা প্রকাশে গঠিত 'সংকলন পর্ষদের' সম্পাদকসহ সকল সদস্য রাত-দিন নিরলস সফল প্রচেষ্ঠার ফলে স্মরণিকাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমি তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সর্বোপরি পূজানুষ্ঠানে যাঁরা মূল্যবান উপদেশ ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইলো গভীর কৃতজ্ঞতা। শারদীয় দুর্গাপূজা সফল হোক - এ কামনা করি।

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

(প্রদীপ কুমার সাহা)

সাধারণ সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

শুভেচ্ছা

বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবাকারে পালিত হয়ে আসছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল কামনায় এ পূজার খুবই গুরুত্ব বহন করে। পূজার সময় মন্দিরে মন্দিরে চণ্ডীপাঠ, অর্চনা, আরতি ও ভক্তদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। অপরদিকে একে অপরের সাথে কোলাকুলি, প্রণাম, আশীর্বাদ, মেলা ইত্যাদি দুর্গাপূজাকে ধর্মীয় আবেশে আনন্দঘন করে তোলে। দুর্গাপূজা সকলের অংশগ্রহণে পরিণত হয় এক উৎসবে। দুর্গোৎসব মানুষে মানুষে সামাজিক বন্ধনের সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিময় ও কল্যাণময় সম্পর্ক। দুর্গাপূজা সর্বস্তরের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্ব অপরিসীম। পূজাবিধি এবং দেবীর প্রতিমার রূপ-কল্পনায় দুর্গাপূজা সর্বজনীন- এ পরিলক্ষিত হয়। দেবী দুর্গা পূজিত হন সমষ্টিগতভাবে। একই সাথে সিদ্ধিদাতা গণেশ, মহাবীর দেবসেনা (সেনাপতি) কার্তিক, ঐশ্বর্যের (ধন-সম্পদের) দেবী লক্ষ্মী ও বিদ্যার (জ্ঞানের) দেবী সরস্বতী পূজিত হন। দুর্গা দেবীর সঙ্গে তাঁর বাহন সিংহ, গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা ও সরস্বতীর বাহন হংস পূজিত হন। পূজার পর শুভ বিজয়া। সমাজের সকল স্তরের জনগণ একত্রে বিজয়ার উৎসব পালন করে। হিংসা-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে ঊর্ধ্বে উঠে মানুষে মানুষে সমাবেশ ঘটে পূজার উৎসবস্থলে। ঐক্যের মেলায় পরিণত হয় প্রতিটি পূজা মন্দির। বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ জন্যই শারদীয় দুর্গাপূজা সামাজিক সম্প্রীতি, মহামিলন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার চিরন্তন উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয়। সম্প্রীতিবিধ্বংসী কোনো প্রচেষ্টা দুর্গাপূজার সর্বজনীনতাকে বিনষ্ট করতে পারে না।

তেজগাঁও এলাকায় কোন মন্দির না থাকায় এলাকায় বসবাসরত সনাতন ধর্মের লোকজন নিয়মিতভাবে পূজা-অর্চনা করার জন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার দাবী বহুদিনের। এ দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এলাকার সাংসদ ও মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ সকলের সার্বিক সহযোগিতায় বিকে আফতাব মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে 'তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির' স্থাপিত হয়েছে। এ মন্দিরে প্রতিদিন শ্রী শ্রী দুর্গা মায়ের অর্চনাসহ অপরাপর পূজা-পার্বন পালিত হচ্ছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার সহযোগিতার জন্য সকল স্তরের লোকজনের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ বিগত পাঁচ বছরের ন্যায় এ বছরও 'তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির'-এ শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এ পরিষদের সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলী ও নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যসহ সাধারণ সদস্য এবং যুব পরিষদের সদস্যবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্ঠায় শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে বলে আমি তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে অপরাজিতা শিরোনামে একটি স্মরণিকা। এ স্মরণিকা প্রকাশে গঠিত 'সংকলন পর্ষদের' সম্পাদকসহ সকল সদস্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করার ফলে স্মরণিকাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দুর্গাপূজায় যাঁরা মূল্যবান উপদেশ, বিজ্ঞাপন ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইলো গভীর কৃতজ্ঞতা।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকলের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা।

(সুখলাল নন্দী)

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার
সম্পাদক
অপরাজিতা সংকলন পর্ষদ
ও
উপদেষ্টা
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

সম্পাদকীয়

শরতের হিমেল হাওয়া, প্রকৃতির অভিনব রূপ, আকাশের নীলাভ রং এবং সাদা মেঘের ভেলা, প্রস্ফুটিত ফুলের সমারোহ মনকে দোলা দেয় আপন আনন্দে। শরতের স্নিগ্ধ ছোঁয়া, কাশবনের দোলা আর শিশির ভেজা ঘাসে থাকা শিউলি ফুলে পাওয়া যায়। প্রকৃতির প্রতিটি গাছে সবুজের সমারোহ। বিলে-ঝিলে লাল-সাদা শাপলা, নদীর কিনারের কাশবন পুরো প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলে আপন মহিমায়। প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্যের মাঝেই শারদীয় দুর্গাপূজার আগমনী সুর বেজে ওঠে। বাঙালি জাতি উৎসবের আমেজ ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে শারদীয় দুর্গাপূজা হয়ে উঠে দুর্গোৎসব। এ দেশে সকলের অংশগ্রহণে শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হয়ে থাকে। দুর্গাপূজা মানেই সর্বজনীন। এখানে উৎসবের আনন্দে বাঙালি জাতির প্রাণের সঞ্চার হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পূজার শুরু থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সকল আয়োজনে সকলের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। দুর্গোৎসবকে ঘিরে আনন্দঘন পরিবেশ এবং মিলন খুবই বিরল। এ পূজা বাঙালি সমাজকে অসহিষ্ণুতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করে মানুষের মধ্যে ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করে। ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র বাঙালিকে। এক মায়াবী বন্ধনে জড়িয়ে রাখে সকল বাঙালিকে।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ ষষ্ঠবারের মত শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে স্মরণিকা 'অপরাজিতা'র শারদীয় সংকলনের ষষ্ঠ সংখ্যা। এ সংকলনটি অতীতের স্মৃতিচারণ, মূল্যবান বাণী, প্রথীতযশা লেখকের লেখা এবং বিজ্ঞাপন সমন্বয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। শারদীয় সংকলন প্রকাশ করা একটি দীর্ঘ সময়ের বিশাল কর্মযজ্ঞ। সম্পাদনার দায়িত্ব আমার হলেও সম্পাদনা পর্ষদ, তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দের একান্ত সহযোগিতা ব্যতীত এ প্রকাশনাটি প্রকাশ করা কোনক্রমেই সম্ভব হতনা। তাঁদের সকলের প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ শারদ সংকলনে মূল্যবান বাণী প্রদান করায় সংকলনের মান বিশেষভাবে গৌরবান্বিত করেছে। আমি তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মাননীয় মন্ত্রীবর্গ ও মেয়রসহ অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ বাণী প্রদান করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। যাঁরা লেখা দিয়ে স্মরণিকা প্রকাশের সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইলো আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। যেসব প্রতিষ্ঠান সংকলনে বিজ্ঞাপন প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন তাদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মুদ্রিত সকল লিখা, লেখকদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুভূতিতে লেখা, এখানে সম্পাদনা পর্ষদের কোন প্রভাব এবং দায়িত্ব নেই। এ শারদীয় সংকলনে দেবী দুর্গার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতাসহ অন্যান্য ধর্মীয় তথ্যসমৃদ্ধ লেখা নিয়ে সহজতর ও নির্ভুল উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পরিষদের মুখপাত্র হিসেবে স্মরণিকাটি প্রকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। স্মরণিকা প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য নিবেদন করছি। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে যে আনন্দ সবার মনের মাঝে জেগে ওঠে তা বাঙালির প্রতিটি গৃহকে আলোকিত করে।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল ও শুভ কামনায়।

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

(ড. নিখিল চন্দ্র সরকার)

Bank Asia

HOME LOAN

MAKE YOUR
DREAM HOME A REALITY

- Loan amount upto 2 Crore
- Maximum 12 month grace period
- Faster Processing

Contact:
16205 (24/7) &
+8801719706663, +8801844490223

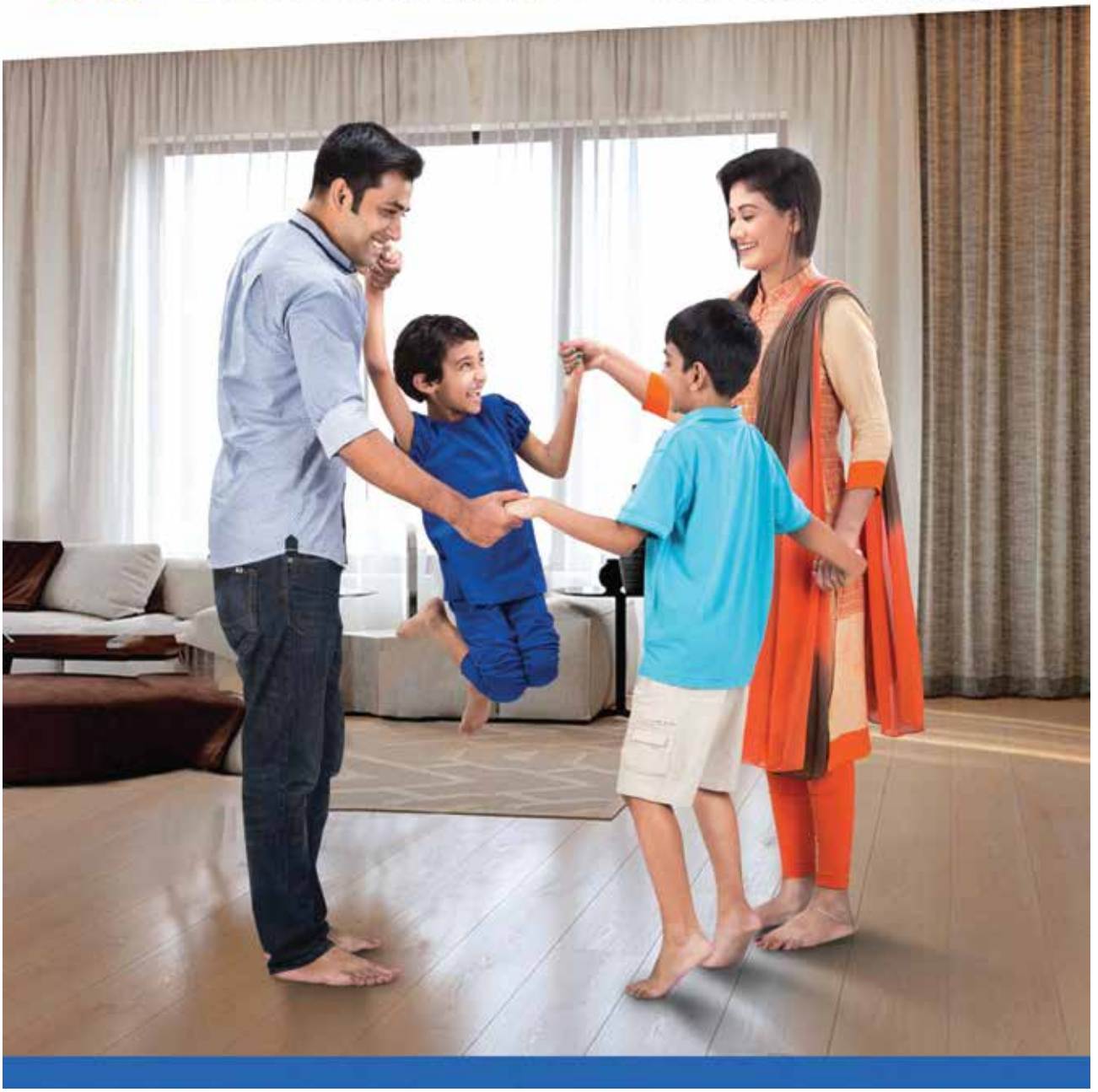

ADMISSION OPEN

25%-100% Scholarship on Tuition Fee (Merit Based)

40% Waiver on Admission Fee

UNDERGRADUATE ACADEMIC PROGRAMS

- B.Sc. in Computer Science & Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical & Electronic Engineering (EEE)
- B.Sc. in Textile Engineering
- B.Sc. in Civil Engineering (CE)
- Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.)
- Bachelor of Laws (LLB)
- Bachelor of Business Administration (BBA)
- BBA in Agribusiness
- Bachelor of Fashion Design and Technology
- BA (Hon's) in English
- Bachelor of Economics
- Bachelor of Education (BEd)

GRADUATE ACADEMIC PROGRAMS

- Master of Business Administration (MBA)
- Executive MBA (EMBA)
- Master of Public Health (MPH)
- Master of Pharmacy (M. Pharm.)
- MBA in Agribusiness
- Executive MBA in Agribusiness
- Master of English
- Master of Education (MEd)

Special Scholarship for Group Admission

SPECIAL FEATURES

- 100% Tuition Fee Waiver for Students with Golden GPA 5.00 in SSC & HSC
- Additional 5% Waiver for Female Students & 5% Waiver for Group Admission
- Highly qualified faculties, modern library and well-equipped labs
- Hostel & Transport Facilities

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত

ATISH DIPANKAR UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (ADUST)

5TH PERMANENT CERTIFIED PRIVATE UNIVERSITY

Address | Sector-15, Uttara, Dhaka- 1230. Call: 01787666575-8, 01777945494

fb.com/ADUST2004
www.adust.edu.bd

জয়ে মা দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী

কান পাতলে আশ্বিনের শারদ প্রাতে প্রকৃতির অন্তর-আত্মার পবিত্র ভাবমাধুরীর সঞ্জীবন অনুভব করা যায়, মন্দিরে মন্দিরে কাসর-ঘণ্টা, ঢাক-ঢোলের নিরবিচ্ছিন্ন যত্ন-আত্মি, ধোয়া-মোছায় মায়ের আগামনী সুর বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। চিরায়ত প্রথায় এবারও সবংসহা দুর্গতি-নাশিনী, মুক্তির বারতা নিয়ে মানুষের মঙ্গল-বার্তা নিয়ে মর্ত্যধামে উপস্থিত।

মানুষ ভক্তিরসে পরম মমতায়, ভালোবাসায়, অন্তরঙ্গ ভালোলাগা মিশিয়ে মাকে বরণ করার প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করে ফেলেছে। বাণী কুমার মহাশয়ের রচনা ও প্রবর্তনা, পংকজ মল্লিক বাবুর সংগীত পরিচালনায় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র-এর সেই ক্লাসিক মহালয়ায় দেবীর আগমন চারপাশকে উৎসব মুখর করে তুলেছে।

সুখ-শান্তি, মঙ্গলার-মঙ্গল সমাচার নিয়ে আসুক মা দুর্গা, মানবের এ শাশ্বত আবেগ, অনুভুতি আর পরম শ্রদ্ধায় উযাপিত হবে শারদীয় উৎসব। জাগতিক এ ধারায় সকল অসুরিক কর্মকাণ্ড দূর হয়ে যাক। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতায় ভরে উঠুক সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় সুদৃষ্টি, ন্যায়পরনয়তা, সকল ধর্মেও লোকজনের মধ্যে প্রগাঢ় ভালোবাসায় সমৃদ্ধ হউক আমাদের এ সুন্দর পৃথিবী।

আসুন নির্জন যমুনার কূলে কৈলাসে কিংবা কদম্বতলে না গিয়ে আমাদের নিকটের চারপাশে থাকা মানুষের মাঝে মা দুর্গাকে খুঁজি। ঈশ্বরের আরাধনা করি। মানবতা জাগ্রত হউক সকলের অন্তরে। রচিত হউক পবিত্র মানবিক পৃথিবী।

FIND OUR COLLECTION

Regal™
Furniture
Furnish Your Dream

নতুন সংসারের শুরুতে
ঘর সাজুক রিগ্যালে

/RegalFurnitureBangladesh www.regalfurniturebd.com regal.bd

বিস্তারিত জানতে
09613737777

দুর্গোৎসব এর এক অনন্য স্বীকৃতি

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর বিশ্ব ধর্মসভায় প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সনাতন ধর্মকে উপস্থাপন করে বিশেষ মর্যাদায়। আর্ন্তজাতিক পরিমণ্ডলে এ এক অনবদ্য অনুরণন তুলেন, বাংলার শিক্ষিত বিদ্যান গেরুয়া তরুণ। তারপর গড়িয়ে গেল দীর্ঘ জলরাশি।

ইতিহাস বলে আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে বাংলাদেশের তাহিরপুরে রাজা কংস নারায়ণ প্রথম জাকজমকভাবে শারদীয় উৎসব উদ্‌যাপন করে চারদিকে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। দশরথপুত্র রাম আর রাজা সুরথও এর আগে শরৎকালে দুর্গা পূজা করেছিলেন। শোনা যায় পলাশীর আমবাগানে নবাব এর মর্মান্তিক পরাজয় এর পর চলে ইংরেজদের ক্ষমতা গ্রহণের গভীর ষড়যন্ত্র। পরবর্তীতে এ অঞ্চলের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আনুকুল্য পেতে ইংরেজরা নানা উপায়ে দুর্গাপুজাকে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করে।

কৈলাশ থেকে উৎসারিত যমুনা দীর্ঘদিন নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে প্রবাহিত হলো। রাজা-মহারাজার অন্দরমহল থেকে মা-দুর্গা উপস্থিত হলেন। সাধারণ মানুষের গৃহে সর্বজনীন বারোয়ারী মন্দিরে আম জনতার হৃদ মন্দিরে। আচার-উপচার-উপাদান উপস্থাপন-উদ্‌যাপনে নানা স্থানিক অবয়বে দুর্গাপুজা উদ্‌যাপিত হতে লাগলো।

প্রাণের এ দুর্গা-উৎসব নিয়ে চলতে থাকে নানা ভাবনা, গবেষাণা ও ধারাবাহিক অধ্যায়ন। এক্ষেত্রে নিভৃতে কাজ করছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি হলেন এক সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপিকা এবং Centre for studies in Social Sciencs এর পরিচালক তপতী গুহ ঠাকুরতা।

২০০৩ সাল থেকে অধ্যাপিকা তপতী দেবী দুর্গোৎসব নিয়ে গবেষণা করা শুরু করেন। ২০১৯ সালে তাঁর এ উদ্যোগে সংযুক্ত হন ভারতীয় সরকারের Ministry of Culture। এই আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় এ গবেষণা কাজে নতুন উদ্যোম যোগ করে।

শুরু হয় নানা প্রান্ত থেকে নানা অংশীজনের তথ্য সংগ্রহ, সবার তথ্যচিত্র সংগ্রহ করার নানা উপায়। সেই মতো তিনি ইউনেস্কোতে এর উপর ভিডিওসহ নানা তথ্য-উপাত্ত উপাস্থাপন করেন।

পরবর্তীতে ইউনেস্কোর- “Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity”-এর অন্তর্ভুক্ত হলো আমাদের গোটা দুর্গোৎসব।

অধ্যাপিকা তপতী গুহ ঠাকুরতার অক্লান্ত পরিশ্রম অনবদ্য মেধা আজ দুর্গোৎসবকে ইউনেস্কোর “সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য”র স্বীকৃতি ও সম্মান এনে দিয়েছে।

এ অর্জন সকলের তাই আবারও তপতী গুহ ঠাকুরতাকে আভূমি প্রণতি জানাচ্ছি।

শারদীয় দুর্গাপূজা : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরন্তন উৎসব

অধ্যাপক ড. অসীম সরকার

'দুর্গ' (দুর্-√গম্+ড) শব্দের সঙ্গে টাপ্ প্রত্যয়যোগে 'দুর্গা' (দুর্গ+স্ত্রিয়াং টাপ্) শব্দটি গঠিত হয়েছে। শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থ অনুসারে দুর্গ (বা দুর্গম) নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই দুর্গা (দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা)। দুর্গম অসুরকে বধ করে জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গা (দুর্গতিনাশিনী) বলা হয়। দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। সকল প্রকার বিপদ থেকে যিনি জীবকে রক্ষা করেন, জগতের কল্যাণ সাধন করেন এবং মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করেন, তিনিই হচ্ছেন দেবী দুর্গা। তিনি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, চণ্ডী, নারায়ণী প্রভৃতি নামে ও বিশেষণে অভিহিত হন। পুরাণে কথিত আছে যে, আদ্যাশক্তি মহামায়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের লক্ষ্যে এবং সমগ্রজীবের কল্যাণার্থে যুগে যুগে ও কালে কালে বিভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে আবির্ভূত হয়েছেন। দেবী দুর্গা তাঁরই বিশেষ সময়ের, বিশেষ যুগের এক বিশেষরূপ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে প্রাচীনকালে ব্রহ্মার বরে পুরুষের দ্বারা অবধ্য মহিষাসুর দেবগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গের অধিকার কেড়ে নিয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণ মহিষাসুরকে হত্যা করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করার জন্য প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং পরে তাঁকে মুখপাত্র করে বিষ্ণু (নারায়ণ) এবং শিবের সমীপে উপস্থিত হন। মহিষাসুরের কাহিনি শুনে তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। সেই ক্রোধে তাঁদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করে। প্রথমে বিষ্ণুর ও পরে শিব ও ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে এক মহাতেজ নির্গত হয়। দেবরাজ ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতার দেহ থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হয়ে মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হয়। বিরাট পর্বতপ্রমাণ ও উজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ একত্রিত ও ঘনীভূত হয়ে অগ্নিবর্ণা, মহাতেজস্বিনী, পরমরূপবতী এক দেবীমূর্তি ধারণ করে। দেবগণের সম্মিলিত শক্তির সংহত বা মিলিতরূপ থেকে আবির্ভূত মহাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী এই দেবী হলেন দুর্গা। সমুদ্র ও বিশ্বকর্মা দেবীকে বহুরকম অলংকার দান করেন। দেবগণও বিভিন্ন প্রকার অলংকার দিয়ে দেবীকে সজ্জিত করেন। তারপর দেবগণ প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্র দেবীকে দান করেন। হিমালয় দেবীকে বাহন হিসেবে সিংহকে দান করেন। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত এই অষ্টাদশভুজা (তবে বাঙালিরা দেবীকে দশভুজারূপে পূজা করেন। তবে শাস্ত্রানুসারে দুর্গার বাহুর সংখ্যা হতে পারে চার, আট, দশ, ষোল, আঠারো বা কুড়ি) দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। দেবী দুর্গাকর্তৃক দুরাত্মা মহিষাসুর নিধন বর্তমানে প্রচলিত দুর্গাপূজার দৃশ্যপট।

শরৎকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা শারদীয় দুর্গাপূজা নামে অভিহিত। আর বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা বাসন্তীপূজা নামে অভিহিত। বাসন্তীপূজা এখনও প্রচলিত থাকলেও শারদীয় দুর্গাপূজাই আবহমান কাল থেকে মহাসমারোহে উৎসবাকারে পালিত হচ্ছে। শারদীয় দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা বেশি। বাসন্তীপূজা মূলত কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আশ্বিন বা কার্তিক মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে) শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত এ পূজা

অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি তিথি যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়াদশমী নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষকে বলা হয় দেবীপক্ষ। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যার নাম মহালয়া।

ক্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করেন। দুর্গাপূজা বসন্তকালের উৎসব হলেও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অকালে অর্থাৎ বসন্তকালের পরিবর্তে শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাপূজার আয়োজন করেন বলে শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকালবোধন বা অকালপূজা বলা হয়। শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত এই ছয়মাসকে বলা হয় দক্ষিণায়ন এবং মাঘ মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত এই ছয়মাসকে বলা হয় উত্তরায়ণ। অতএব শরৎকাল হলো দেবতাদের দক্ষিণায়ন (রাত্রিকাল)। শরৎকাল দেবতাদের পূজার যথাযথ সময় নয়। অকালের পূজা বলে এই পূজার নাম অকালবোধন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ। ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আয্হা, ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী, জন্মাষ্টমী, শারদীয় দুর্গোৎসব, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বড়দিন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ কোনো বিশেষ ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয় প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব। জাতীয় চেতনায় এবং শান্তি প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগানকে সামনে রেখে সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল গোষ্ঠীর মানুষ সাড়ম্বরে পালন করে প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব।

শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সমগ্র বাঙালির কাছে এ পূজা চিরায়ত ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এক অনুপম প্রীতিময় আনন্দ উৎসব। অশুভ ও অপশক্তির পরাজয় এবং শুভশক্তির জয়, সত্য ও সুন্দরের আরাধনায় সর্বজীবের মঙ্গল সাধন শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অশুভ ও আসুরিক শক্তি দমনের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার, সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, সকল মানুষের সমধিকার নিশ্চিতকরণ, মানুষের মধ্যকার সকল প্রকার বৈষম্য বা ভেদাভেদ ও অন্যায়, অবিচার দূরীকরণ এবং অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, হানাহানিমুক্ত অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমাজগঠন করার শিক্ষালাভই দুর্গোৎসবের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

শারদীয় দুর্গোৎসব সমাজকে অসহিষ্ণুতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করে মানুষের মধ্যে ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করে। ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র বাঙালিকে। এক মায়াবী বন্ধনে জড়িয়ে রাখে সমস্ত বাঙালিকে। উদ্বুদ্ধ করে ভ্রাতৃবোধ ও সম্প্রীতি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে। সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করে। দুর্গোৎসবের শুভ্র ও আনন্দ জাগানিয়া পরশ শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দু ধর্মানুসারীদেরই নয়, এর চিরায়ত ঐকতান স্পর্শ করে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়কে। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে যে অনাবিল আনন্দ সবার মনের মাঝে জেগে ওঠে তা বাঙালির প্রতিটি গৃহকে আলোকিত করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল ও হিতকামনায়।

সকল ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে সৃষ্টির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা, সমগ্র জীবের কল্যাণ সাধনই ধর্মের মূল লক্ষ্য, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন নয়। এই চেতনাকে মনে-প্রাণে ধারণ করেই সকল মানুষের সুখ-শান্তি কামনায় এবং সর্বজীবের মঙ্গলার্থে আবহমান কাল ধরে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পালন করে শারদীয় দুর্গোৎসব, আরাধনা করে দেবী দুর্গার। সকল প্রকার হীনতা, সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতার উর্ধ্বে উঠে সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই চেতনাকে ধারণ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন করে এবং আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। সকল বাঙালি মিলিত হয় অভিন্ন মোহনায়, অভিন্ন চেতনায়। পূজার ধর্মীয় অংশটুকু হিন্দুদের; কিন্তু মেলা, উৎসব ও আপ্যায়নে অংশগ্রহণ এবং আনন্দ উপভোগ করেন সবাই। সকলের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে শারদীয় দুর্গাপূজা পরিণত হয় সর্বজনীন উৎসবে, পরিণত হয় সর্বস্তরের মানুষের মিলনমেলায়, পরিণত হয় অন্যতম জাতীয় উৎসবে। ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে এ উৎসব পরিণত হয় সম্প্রীতিময় আনন্দযজ্ঞে। সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আবহ এবং ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় সকল মানুষের হৃদয়; দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় ভাতৃত্বের বন্ধন। পূজা থেকে উৎসবে রূপান্তরের এই যে প্রক্রিয়া, এটি বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক সত্তার চিরন্তন বহিঃপ্রকাশ।

অতীত থেকেই দুর্গাপূজা উৎসবাকারে পালিত হয়ে আসছে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে। সকলের মঙ্গল ও হিতকামনায়, এমন বৃহত্তম আয়োজন খুবই গুরুত্ব বহন করে। পূজার সময় মন্দিরে মন্দিরে ভক্তিমূলক গান,

চণ্ডীপাঠ, অর্চনা, আরতি, ভক্তদের শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং সেই সাথে কোলাকুলি, প্রণাম, আশীর্বাদ, মেলা ইত্যাদি দুর্গোৎসবকে ধর্মীয় আবেশে আনন্দঘন করে তোলে। দুর্গোৎসব মানুষে মানুষে মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিময় ও কল্যাণময় সম্পর্ক। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা সর্বস্তরের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্গাপূজা সর্বজনীন উৎসব এটা শুধু কথার কথা নয়- পূজা বিধিতেও তা লক্ষ করা যায়। দেবী দুর্গা মৃণ্ময়ী প্রতিমায় সপরিবারে পূজ্যপাদ। দুর্গার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ, মহাবীর দেবসেনা কার্তিক, ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী ও বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজিত হন। দেবাদিদেব মহাদেবের স্থান থাকে সবার উপরে। দুর্গা দেবীর সঙ্গে তাঁর বাহন সিংহ, গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর বাহন হংস, এমন কি মহিষাসুরও পূজিত হন। সকলে একত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। পূজার পর শুভ বিজয়া। বিজয়ায় অবাধ মিলন। নির্বিশেষে সকল মানুষ একত্রে বিজয়ার উৎসব পালন করে। সকল বাধা ও মনের সংকীর্ণতা দূর করে অনৈক্য-বিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূরে ঠেলে মানুষে মানুষে সমাবেশ ঘটে পূজার উৎসবস্থলে। সকলের সহাবস্থান আর ঐক্যের মেলায় পরিণত হয় পূজার মন্দির। প্রকাশিত হয় বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনা। এ জন্যই শারদীয় দুর্গাপূজা সামাজিক সম্প্রীতি, মহামিলন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার চিরন্তন উৎসব। সম্প্রীতিবিধ্বংসী কোনো প্রচেষ্টা দুর্গাপূজার সর্বজনীনতাকে বিনষ্ট করতে পারবে না। বাঙালি জাতিসত্তার মর্মমূলে গ্রথিত ঐকতানের কাছে তা পরাভূত হবেই। আপামর জনতা দুর্গোৎসবে সামিল হয়ে উৎসবের আমেজে যে ঐক্যচেতনায় বাধা পড়েছে তা ছিন্ন করার ক্ষমতা কারোর নেই। কোনো ঠুনকো আঘাতে এ বন্ধন কোনো দিন ছিন্ন হবে না।

দুর্গাপূজা যদিও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা হিন্দুদের, কিন্তু মূলবাণী সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক চেতনা। দুর্গোৎসবে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক সামাজিক বন্ধন ও অসাম্প্রদায়িক পরিচয় ফুটে ওঠে, ভ্রাতৃত্ববোধের এক নতুন আবহ তৈরি হয়। দেবীর যুদ্ধরতরূপ লোকশিক্ষার একটি দৃষ্টান্ত। এটি হচ্ছে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির যুদ্ধ, অন্যায়, অসত্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়, সত্য ও সদাচারের সংগ্রাম। দেবীর বন্দনার প্রেক্ষাপট হলো অন্তরের আসুরিক শক্তির বিনাশ। দুর্গাপূজা হচ্ছে শক্তি অথবা ঐশ্বরিক শক্তির আরাধনা। দেবীর 'দশ হাত' ঐক্য বা সম্মিলিত শক্তির প্রতীক। ঐক্যবদ্ধভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, অন্যায়কে প্রতিহত করার শিক্ষাই দেবীর প্রতিমা হতে শিক্ষণীয়। সুতরাং দুর্গাপূজা শক্তি, সংহতি বা ঐক্যের প্রতীক।

সমাজপ্রগতির নানান অনুষঙ্গের মধ্যে ধর্ম কিংবা ধর্মীয় আচার অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। ধর্মীয় আচার যখন কোনো একটা জাতির জীবনে উৎসবের মর্যাদা প্রাপ্ত হয় তখন তা ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে অগ্রবর্তী সমাজ কাঠামোর ভিত্তিমূলের চলমান সোপান। বাঙালির জীবনে শারদীয় দুর্গোৎসব তেমনি এক বহমান অসাম্প্রদায়িক চেতনসত্তার প্রতিরূপ। যেখানে থাকে না কোনো জাত-পাতের বাছ-বিচার, থাকে না কোনো ভেদাভেদ, থাকে না সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। বাঙালি যে অসাম্প্রদায়িক জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তা প্রতিবছরই প্রমাণিত হয় দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়ে। এ কারণেই দুর্গোৎসব হচ্ছে সম্প্রীতির আর বাঙালির আনন্দ উচ্ছ্বাস উদ্‌যাপনের উৎসব– এক মহামিলনধর্মী সত্যিকার অসাম্প্রদায়িক উৎসব।

অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, সংস্কৃত বিভাগ;
ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট;
উপদেষ্টা, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র;
সাবেক প্রাধ্যক্ষ, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মায়ের আগমনী বার্তা ও সংগীত

ড. দেবপ্রসাদ দাঁ

উৎসব শব্দটা বাংলা সংস্কৃতির একটি প্রাচীনতম এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত শব্দ। বাংলা লোকসংস্কৃতি শব্দটা যখনই ব্যবহৃত হয়, ঠিক তখনই উৎসব নামক এই বাংলা শব্দটি চলে আসে। বাংলা লোকসংস্কৃতির একেকটি অংশকে বিভিন্ন পার্বণ হিসেবে ধরে নিয়ে বাংলা ছয় ঋতুর বারো মাসে তেরো পার্বণে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যার একটি অংশ পূজাপার্বণ। আমাদের সমাজব্যবস্থায় বসবাসরত যে কয়টি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে এর মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী এই চার সম্প্রদায়ের ভেতর হিন্দুদের বার মাসে তেরোটি পার্বণ লক্ষ্যণীয়।

পূজা মানেই ছন্দায়িত ঢাকের শব্দ আর ধূপের গন্ধ; যেন তা প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে একাকার। শরতের শিশির ভেজা শিউলি ফুলের সুবাসিত গন্ধ মায়ের আগমনবার্তা বয়ে নিয়ে আসে তার আপন মহিমায়। দেবীর আবির্ভাব এবং আগমনকে ঘিরে অনেক কথা প্রচলিত রয়েছে। মা দুর্গার আবির্ভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণে না গিয়ে সংক্ষেপিত রূপে শুধু এটুকু বলি, যখন মহিষাসুর শিবের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করেন তখন শিব তাঁকে এরূপ বর দান করেন যে, ত্রিলোকের অধিপতি হিসেবে কোন দেবতা তাঁকে নিধন করতে পারবে না। এ বর লাভ করার পর অসুরকূলের রাজা মহিষাসুর দেবতাদের উপর অত্যাচার শুরু করে। অত্যাচারের ফলে দেবতাদের শান্তি ভঙ্গ হয়ে পড়লে দেবতারা শিবের স্মরণাপন্ন হয়। দেবতাদের এই দুরাবস্থা দেখে নারায়ণ এবং অন্যান্য দেবতাদের শক্তি একত্রিত হয়ে এক মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই মহাশক্তিই হলেন মা দূর্গা। মা দুর্গার আবির্ভাবের পর অসুরকূল নিধন হলো এবং ত্রি-লোকে শান্তি ফিরে এলো। মূলত বলা যায়- যখনই সত্যের অবক্ষয় ঘটে, অত্যাচারীর অত্যাচার লব্ধ হয়ে ওঠে, পৃথিবীতে তখনই সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন রূপে দেবতাদের আবির্ভাব ঘটে। তারই একটি রূপ বা শক্তি মা দুর্গা। কখনও তিনি মেয়ে, কখনও বা তিনি প্রলয়ঙ্করী, আবার কখনও তিনি মাতৃরূপিণী। বাসন্তি, দুর্গা, উমা, চণ্ডী, মাতৃরূপিণী কালিকা, বিভিন্ন নামে তিনি আবির্ভূত হন।

শাক্ত পদাবলীর দু'টি ধারা, একটি–চণ্ডী কন্যারূপিণী উমাতে, অপরটি মাতৃরূপিণী কালিকাতে পরিণতি লাভ করেছে। সাধক কবি রামপ্রসাদ এই উভয় ধারারই প্রতিষ্ঠাতা হলেও তাঁর পরবর্তী সময়ে এই দু'টি ধারা স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। একটির মধ্যে গার্হস্থ্যের সুর প্রবল, আর একটিতে আধ্যাত্মিকতা। প্রথম ধারাটি আগমনী বিজয়ার গান ও দ্বিতীয়টি শ্যামাসংগীত নামে পরিচিত। শাক্তগীতির ধারা সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া ভালো- বৈষ্ণব পদ সংগীত রচনার ধারা ক্ষীণ হয়ে আসলে শাক্তগীতিকে অবলম্বন করেই বাংলা গান উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব পদাবলীর তুল্য কাব্যভৈরব বা সংগীত গরিমা শাক্তপদে ছিল না। তবে, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই ধারায় শত শত বাঙালি কবি ও সংগীতকার গান রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব ছিল এই গীতিধারার প্রবর্তনে এবং বৈষ্ণব পদ সংগীত রচনায় ভাটা পড়লে শাক্তপদই তার গানের ক্ষেত্রে নতুন প্রবাহ রচনা করে। এ প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করেছেন শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গম' গ্রন্থের সূচনাতেই। তিনি বলেছেন: পূর্ণিমা-প্রভাতে যেমন ম্লানায়মান চন্দ্রমণ্ডলের চারিদিকে উদয়োন্মুখ সূর্যের রক্তিম আভা ক্রমশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেইরূপ বাংলার সাহিত্যাকাশে বৈষ্ণব কবিতার পূর্ণচন্দ্র অস্তাচলে হেলিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শাক্তসাধনার সৌরকরজ্জ্বোল প্রখর হইয়া উঠিল বাংলা সাহিত্যে শক্তিকেন্দ্র ও প্রাণস্পন্দনের আঁধার স্থানান্তরিত হইল। এই পরিবর্তনের ক্রমস্ফুরিত ইঙ্গিত ও বিক্ষিপ্ত ধারাগুলি কেন্দ্রিভূত হইয়াছে রামপ্রসাদের সাধনায় ও গানে।

রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কে একটু বলে নেই। রামপ্রসাদ সেন (আ ১৭২০-১৭৮১) বর্তমান পশ্চিম বাংলার চব্বিশপরগণা জেলার কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামরাম সেন। অল্প বয়সেই রামপ্রসাদ সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, ফারসি প্রভৃতি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। শৈশব থেকেই রামপ্রসাদ ভাবুক স্বভাবের ছিলেন। সংগীতে ও শ্যামা আরাধনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। রামপ্রসাদের প্রধানতম কীর্তি তাঁর শ্যামাসংগীত; উমা সংগীত ও তাঁর বৈশিষ্ট্যময় সৃষ্টি। এছাড়া শিব ও কৃষ্ণ বিষয়ক কিছু পদও তিনি রচনা করেন। রামপ্রসাদ সেনের এক অসামান্য অবদান প্রসাদী সুর। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে বাউল সুর মিশিয়ে তিনি যে সুর গঠন করেছিলেন তা তাঁর নামানুসারে প্রসাদী সুর নামে খ্যাত। আগমনী নামে খ্যাত উমাসংগীতের ধারাটিরও সূত্রপাত করেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ।

আগমন থেকে আগমনী। দেবী দুর্গার মর্তে আগমনকে কেন্দ্র করে এই গান রচিত বলে একে বলা হয়েছে আগমনী। তবে দেবীর আগমনের অনুষঙ্গ এখানে রূপায়িত হয়নি। শ্যামাসংগীতেও যেমন তিনি উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে গভীর মানবতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, উমাসংগীতেও করেছিলেন ঠিক তাই। বরং উমা সংগীতে মানবায়িত বোধ আরো অগ্রসর হয়ে তাকে একান্ত মানবিক সংগীতের স্তরে উত্তীর্ণ করেছিল। বৈষ্ণব কবিদের গোষ্ঠপদে জগদীশ্বরী দেখা দিয়েছেন স্নেহবৎসল মাতৃরূপে, আর রামপ্রসাদ রচিত উমাসংগীতে জগদীশ্বরী দেখা দিয়েছেন স্বামীগৃহবাসী কন্যা রূপে। এখানে দিবসত্রয়ের জন্য কৈলাসগৃহ থেকে দুর্গার মর্ত্যে আগমন; স্বামীগৃহ থেকে বাঙালি গৃহস্থকণ্যার পিতৃগৃহ আগমনের প্রতিরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। কন্যার জন্য মায়ের উৎকণ্ঠা, তার আগমনে মায়ের আনন্দ এবং মাত্র তিনদিন পরেই তার পতিগৃহে প্রত্যাবর্তনে মায়ের অশ্রুপাত, সবই গভীর মমতার সঙ্গে আগমনী গানে রূপায়িত হয়েছে।

রামপ্রসাদ যখন সংগীত রচনায় নিয়োজিত হন তখন বাঙালি গৃহস্থকন্যার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। খুব অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হতো, যাকে বলা হতো গৌরীদান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়স্ক ও পত্নীর প্রতি অমনোযোগী স্বামীর গৃহে মেয়েদের নানা দুঃখ কষ্ট ঘটতো। সেই বেদনায় যেন হৃদয়মথিত ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে রামপ্রসাদের আগমনী পদাবলীতে। বিষয়টি চমৎকারভাবে বিবৃত করেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে– "বাঙ্গালির গৃহস্থজীবন নানা স্নেহসম্পর্কের দ্বারা বিজড়িত। এই সমাজের মাতাপিতা নিজেদের শিশুকন্যাকে গৌরীদান করিয়া যেভাবে পরের সংসারে পাঠাইয়া দিতেন তাহাতে তাঁদের অতৃপ্ত সন্তানস্নেহ অন্তরের মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। তারপর কোন অনুকূল অবস্থা পাইলেই তাহা সহস্রধারায় বিগলিত হইয়া পড়িত। বাংলার আগমনী বিজয়া গানগুলি এই স্তম্ভিত অশ্রুনির্ঝরের মুক্তিসংগীত। অপরিণত বুদ্ধি শিশুকন্যাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্বামীগৃহে অদর্শনে পাঠাইয়া দিয়া এই সমাজের জননীগণ বাৎসল্যরসের অতৃপ্তিজাত যে আশঙ্কা ও উদ্বেগাকূল জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, বাঙালির আগমনী বিজয়া গানে তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। মধ্যবিত্ত বাঙালির গৃহসংসার চিরদারিদ্র্যের লীলা নিকেতন। দারিদ্র্যের সংসারে দুঃখের অন্ত নাই; সেই জন্য বৎসরান্তে কিংবা যে কোনদিন এই সন্তান বিচ্ছেদের অবসানে স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ে তাহার সন্তান সম্পর্কে এই অশুভ দারিদ্র্যের শঙ্কাই সর্বপ্রথম জাগিয়াছে-

কেমন করে হরের ঘরে
ছিলি উমা বল মা তাই,
চিতাভস্ম মাখি অঙ্গে
জামাই ফিরে নানা রঙ্গে
তুই নাকি মা তারি সঙ্গে

সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই ।।

পিতা হিমালয় ও মাতা মেনকার কন্যা শিবপত্নী উমা মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুকন্যার প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দেন।" আগমনী গান সপ্তমী, নবমী ও বিজয়া এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সপ্তমী উমার আগমনমূলক রচনা, তাতে উমার আগমনে মাতা মেনকার উল্লাস প্রকাশ পায়। নবমী শ্রেণীর গানে আসন্ন বিজয়ার বেদনার পূর্বাভাষ ফলিত হয়। বিজয়া শ্রেণীর গানে উমার বিদায়জনিত ব্যথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উমা মেনকার কাহিনীকে কেন্দ্র করে দ্বিজ রামপ্রসাদ এক ধরনের পারিবারিক সংগীত রচনার দীর্ঘ ঐতিহ্যের সুত্রপাত করেছিলেন। নিম্নে একটি প্রসাদী আগমনী গান উদ্ধৃত করছি–

পিলু বাহার। যৎ
গিরি! এবার উমা এলে
আর উমা পাঠাব না।
বলে বলুক লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।।
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়
এবার, মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মানব না।।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়
তিনি শ্মশাণে মশানে ফিরে
ঘরের ভাবনা ভাবে না।।

মা দুর্গার আগমনী ও স্বরূপ বর্ণনা নিয়ে রামপ্রসাদ এবং তৎকালীন সময়কার কবি সাধকদের রচনা শৈলীর প্রকাশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এবার আসা যাক তাঁর পরবর্তী সময়ের রচয়িতাদের মহালয়া বা মহিষাসুর মর্দিনি সম্পর্কে আলোচনায়, যার মাধ্যমে দুর্গার মহিমান্বিত বর্ণনা আরো বেশি মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। ১৯৩২ সালে আকাশবাণী কলকাতা (অল ইন্ডিয়া রেডিওতে) প্রথম মহালয়া উপস্থাপিত হয়। এই মহালয়াটি চণ্ডীপাঠ ও সংগীত সংযোজনের মাধ্যমে দেবী দুর্গার স্বরূপ বর্ণনার প্রয়াস পায় এবং একই সাথে প্রসার ঘটে। চণ্ডীপাঠের সেই অপূর্ব সুর এবং উচ্চারণ ভঙ্গি শুনলে যাঁর কথা মনে আসে তিনি হলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ভারতীয় রাগ সংগীতের ধারায় বিভিন্ন রাগে সুরের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এই মহালয়া আজও মানুষের মনের মণিকোঠায় অবস্থান করছে। আকাশবাণীতে প্রচারিত এই অনুষ্ঠানের পাণ্ডুলিপিটি রচনা করেছিলেন বাণী কুমার এবং সংগীত পরিচালনায় ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। মহালয়াতে সংগীত পরিবেশন করেন- দ্বীজেন মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, বিমল ভূষণ, উৎপলা সেন, তরুণ বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণা দাসগুপ্ত, সুমিত্রা সেন, অসীম ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীপা বসু, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

মহালয়ার উল্লেখযোগ্য গানগুলি এবং শিল্পীবৃন্দ হলো-বাজলো তোমার আলোর বেনু (সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, শ্যামল মিত্র, সুপ্রীতি ঘোষ)

* ওগো আমার আগমনি (শ্রীপা বসু)
* জয়ন্তি মঙ্গলা কালি (পঙ্কজ মল্লিক)
* জাগো দুর্গা জাগো (দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়)
* তব অচিন্ত (মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

মহালয়া বা মহিষাসুর মর্দিনি সম্পর্কে আলোচনা করলে যেমন সুর ও ছন্দের একটি বিষয় এসে যায়; তেমনিভাবে এসে যায় পূজায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের কথা। ঢাক, ঢোল, কাঁসা, সানাই, ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রগুলো আদিকাল থেকেই পূজায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যা পূজার একটি রীতি হিসেবে আমরা মনে করতে পারি। মানুষের ভিতর একটি আন্দোলিত কম্পন বা বিশেষ একটা অনুভূতির সৃষ্টি করে শব্দ। বিষয়টি একটু ভাবলে ঠিক এমন কিছু মনে হয় যে, মা দুর্গার আগমনে অশুভ শক্তিকে শুভ শক্তিতে তরান্বিত করে পৃথিবীতে শান্তি বর্ষিত হবে এই আত্মবিশ্বাসে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

পূজা মানেই সংগীত, এই সংগীতের বা সুরের ব্যবহার আমরা সব সময় লক্ষ্য করে থাকি। লোকসংস্কৃতি বা শিল্পচর্চার একটি বিশেষ মাধ্যম সংগীত। সুর শ্রবণে মানুষের উপলব্ধি জাগ্রত হয়। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সংগীত সন্ধ্যা বা সংগীত আয়োজন মানুষকে উৎসব বিষয়টি উপলব্ধি করাতে আরো বেশি উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

তথ্য নির্দেশ:

১। *আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৫৮*
২। *শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি তীর্থসঙ্গমে, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯৬*
৩। *অরুণ কুমার বসু, বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৭৮*
৪। *জয়গুরু গোস্বামী সম্পাদিত, চারণকবি মুকুন্দদাস, রবীন্দ্র লাইব্রেরী কলকাতা, ১৯৭২*

চেয়ারম্যান
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দেবী দুর্গার আবাহনের তাৎপর্য

ড. কালিদাস ভক্ত

প্রকৃতিতে শারতের আগমনে নানা বৈচিত্র বিরাজ করে। মাঠে মাঠে ঘাসে ঘাসে শিশিরের নরম আলপনা আঁকে। শিউলী ফুলগুলো ঝরঝর করে পড়ে শারদের আঙিনায়। ধানের ক্ষেতে কোমলতা-সরলতার প্রতীক হয়ে দামাল হাওয়া দোল খেয়ে যায়। আকাশে মেঘের ভেলা উড়ে উড়ে চলে। অতি সুনীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলার ছায়া পড়ে শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতিতে। তটিনীর তটে বিকশিত শুভ্র প্রাণের নয়নাভিরাম কাশফুল শুভ্রতার প্রতীক হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বনে বনে বিহগকুল আনন্দে-কল-কাকলিতে মুখরিত করে। ভ্রমরেরা আলোর বন্যায় মেতে বেড়ায়। আকাশে বলাকা বেঁধে রাজহংসের দল সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলে উড়ে চলে মানস সরোবরের পানে। বাংলার এই সৌন্দর্যময় পরিবেশে, মায়াময় ক্ষণে নিশ্চয়ই কোনো শুভবার্তা শোনা যাবে। আমাদের প্রাণের দেবী মহামায়া এই মহাতিথিতে মর্তে অবতরণ করে করুণার আঁখি উন্মিলন করেছেন। তিনি সর্বশক্তিমান মাতৃরূপী দুর্গা। তবে তিনি নিরাকার হয়েও যেকোনো আকার ধারণ করতে পারেন। তিনি বিশ্বকার্যের জন্য অপ্রপঞ্চ হতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি চিন্ময় জগত থেকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় সাকাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি শক্তির দেবী। মাতৃরূপী আদ্যাশক্তি মহামায়া। তিনি মহাজাগতিক শক্তির অধিশ্বরী। তিনি দুর্গতি নাশ করেন বলে তাঁকে দুর্গা বলা হয়। আবার তিনি দুর্গম নামক অসুরকে বিনাশ করেছেন তাই তাঁর নাম দুর্গা। মার্কেণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'শ্রীশ্রী চণ্ডী' নামক গ্রন্থে দুর্গার আবির্ভাবের কাহিনী ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে যখন খুব খারাপ অবস্থা বিরাজ করে, অশুভ শক্তির কাছে শুভ শক্তি পরাস্ত, সমাজে বিরাজ করে চরম বিশৃঙ্খলা তখন দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য সমস্ত অশান্তি অরাজকতা বিদূরীভূত করে, দেবী মহামায়া শান্তির আবাস নির্মাণ করেন।

সনাতন শাস্ত্রানুসারে দেবী দুর্গার আগমন ও গমনের বাহনের উপড় নির্ভর করে পৃথিবী বাসীর সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্টের মাত্রা। এবার মা আসবেন গজে চড়ে। গজে করে আগমনের ফলে ফল-ফসলে ভরে যায় ধরণী। তবে মা যাবেন নৌকায় চড়ে। যার ফল খুব একটা ভালো হয় না। যার পূর্বাভাস হিসেবে সিলেটসহ পৃথিবীর নানা স্থানে জল-প্লাবনে-বন্যার ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি লক্ষ্য করা যায়। গত বছর দেবী ঘোড়ায় আগমনের ফলে পৃথিবী জুড়ে করোনার মতো রোগ মহামারী আকার ধারণ করেছে। আবার দোলায় গমনের ফলও ভালো হয়নি। এভাবে সঠিক বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা গেছে। তবে তিনি মাতৃরূপা পরম দয়াল। জগতের কল্যাণের জন্য, সন্তানের মঙ্গলের জন্য দুঃখ-ব্যাথা লাঘব করবেন। তবে সেজন্য তাঁর পূজায়, তাঁর আরাধনায় রত হতে হয়। তাঁর আবির্ভাবের কাহিনিতে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এরকম দৃষ্টান্ত প্রতিভাত হয়েছে। এখানে তেরটি অধ্যায়ে সাতশত শ্লোক আছে। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বলা হয়ছে – ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে মহিষাসুর নামক এক অসুর দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে। দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হন। স্বর্গরাজ ইন্দ্রসহ সকল দেবতারা মিলিত হয়ে ব্রহ্মা ও শিবের কাছে যান। ব্রহ্মার পরামর্শে সবাই মিলে বিষ্ণুর কাছে যান। মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনি শুনে সবাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁদের শরীর থেকে তেজ বেরুতে থাকে। সকল দেবতাদের তেজ একত্রিত হয়ে এক তেজোপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। সেই তেজোপুঞ্জ এক নারীর রূপ নেয়। এই নারীই দেবী দুর্গা। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকে শক্তির পূজা চলে আসছে। তবে বঙ্গদেশে এর প্রসার ও প্রচার সর্বাধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। গবেষকদের মতে সম্রাট আকবরের সময়ে ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বর্তমান রূপের শারদীয় দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়। বাংলায় দুর্গাপূজা সুচিত হয় উত্তরবঙ্গের রাজশাহী অঞ্চলের রাজা কংসনারায়ণের সময়ে। এ পূজা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী রাজাকে বলেছেন– 'কলির যুগে মহাযজ্ঞ হচ্ছে দুর্গোৎসব। এ অনুষ্ঠানে সকল যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তাই আপনি দুর্গাপূজা করুন।' বেদে দেবী দুর্গার উল্লেখ আছে। রামায়ণে রামচন্দ্র ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়ে দুর্গা দেবীর পূজার আয়োজন করেছিলেন এবং মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে জয়ের জন্য দুর্গাপূজার উপদেশ দিয়েছিলেন। সর্ব প্রথমে বসন্তকালে বাসন্তী দুর্গাপূজা হতো। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য বসন্তকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন। তাঁদের পূজা করার পেছনের কাহিনি হলো – রাজা সুরথ রাজ্য হারিয়ে বনে বনে ঘুরছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন মেধা নামে এক মহর্ষির আশ্রমে। অন্যদিকে সমাধি নামে এক বৈশ্য স্ত্রী ও সন্তানদের আচরণে অসন্তুষ্ট

হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনিও ঘুরতে ঘুরতে আসেন মেধা মুনির আশ্রমে। আশ্রমে এসেও হারানো রাজ্যের জন্য রাজা সুরথের মনে মায়া কাজ করেছিল। আবার সমাধি বৈশ্যর তার স্ত্রী-পুত্রদের ভুলতে পারছিলেন না। কেন এই অন্তরের আকর্ষণ! রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের দেখা হলো। দুজন দুজনের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করলেন। তারপর গেলেন মহর্ষি মেধার কাছে। গিয়ে জানালেন নিজেদের অন্তরের কথা। মহর্ষি মেধা বললেন যে, এর নাম মায়া। আর এ মায়া হচ্ছে মহামায়ার প্রভাব। তবে মহামায়া সন্তুষ্ট হলে তিনি কৃপা করেন এবং মুক্তি দান করেন। মহর্ষি মেধা মহামায়ার মাহাত্ম্য রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের কাছে বর্ণনা করলে দেবীর কৃপায় তাদের জাগতিক ও মানসিক অশান্তি দূরীভূত হয়। মহামায়া দুর্গারূপে দুর্ধর্ষ অসুররাজ মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। অসুরদের অত্যাচার হতে দেবগণ মুক্ত হলেন, ফিরে পেলেন তাদের প্রিয় স্বর্গ রাজ্য। দেবী দুর্গার আবাহনের মধ্য দিয়ে ধরামাঝে নারীর শক্তি প্রকাশ পায়। বিভিন্ন মনীষীরা দুর্গা রূপেই নারীকে কল্পনার কথা বলেছেন। তাঁর পূজার মাধ্যমে নারীর ভূমিকাকে আরো বড় করে দেখানো হয়েছে। দেবী দুর্গাকে জগজ্জননী রূপে বন্দনা করার মাধ্যমে নারীকেও মাতৃরূপে রূপায়িত করা হয়েছে। দুর্গা মহিষাসুর বধকারী হিসেবে মহাশক্তির দিয়ে অপশক্তি অপসারিত করেছেন। এমনিভাবে দেবী দুর্গা সৃষ্টির প্রতীক, সমৃদ্ধির প্রতীক, সুরক্ষার প্রতীক। নারীও মাতৃরূপে সৃষ্টির প্রতীক, সন্তান জন্ম দিয়ে সন্তানের মুখে আহার তুলে দিয়ে, সন্তানকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। মহামহিমাময় নারী জগৎ সংসারে ভালোবাসা দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে, শক্তি দিয়ে বিজয়ী করে

মায়ের কাছে প্রার্থনা –

পরিত্রাণ করছেন। এই মাতৃসম নারী যেন বঞ্চনার শিকার না হন। সেই সাথে খারাপ প্রবৃত্তির আক্রোশে শিকার হয়ে নারীরা যেন কলঙ্কিত না হন। সবাই মিলে মহৎতম গুণ দিয়ে ধরাকে আনন্দ ধাম করতে হবে। দেবী দুর্গার অবাহন হোক অশুভ শুক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির প্রকাশ। বৈশ্বিক দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের পন্থাধারী। শোসনের বিরুদ্ধে প্রতিপালনের অহ্বান। অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের প্রকাশ। সাম্পদ্রায়িকতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতার মেলবন্ধন। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে উদার ধারণার উন্মেষ। অসুরশক্তির বিরুদ্ধে সুরশক্তির জয়গান। দুঃখ-কষ্ট থেকে আনন্দের প্রকাশ। শত বিপদ থেকে মা যেন সন্তানকে রক্ষা করেন। তাই

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥"
(শ্রীশ্রীচণ্ডী- ১১/১০)

হে দেবী, তুমি সর্ব প্রকার কল্যাণদায়িনী। তুমি মঙ্গলময়ী ও সর্ব প্রকার ইচ্ছাপুরণকারী, একমাত্র শরণ যোগ্যা। হে ত্রিণয়নী গৌরি, নারায়ণী তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

সহকারী অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজয়া দশমী : "তত্ত্ব ও তাৎপর্য"

সুভাষ মজুমদার

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় দেবী মহামায়াকে বিশ্বপ্রকৃতিকে, আদ্যাশক্তি দেবী যোগমায়াকে ব্রহ্মের শক্তিজ্ঞানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ব্রহ্ম তার শক্তি বলেই সগুণ হন এবং সগুন হলে তিনি সৃষ্টিকার্যে রতী হন। এই ব্রহ্মই সগুন হয়ে পালন করেন এবং ধ্বংস করে ভারসাম্য রক্ষা করেন। ব্রহ্ম যে রূপে সৃষ্টি করেন, তার নাম ব্রহ্মা; তিনি যে রূপে পালন করেন, তার নাম বিষ্ণু এবং যে রূপে ধ্বংস করে ভারসাম্য রক্ষা করেন, তার নাম শিব। এক থেকে তিন আবার তিনে মিলে এক।

আবার ব্রহ্ম যখন সৃষ্টিকার্যে ব্রতী হন, পালন করেন এবং ধ্বংস করে ভারসাম্য রক্ষা করেন, তখন এক কথায় তাকে 'ঈশ্বর বলা হয়। 'ঈশ্বর' শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রভু। ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয়ের প্রভু। আবার ঈশ্বর যখন ভক্তকে কৃপা করেন, তখন তাকে বলা হয় ভগবান। সুতরাং ঈশ্বর বা ভগবান আলাদা কেউ নন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম। এক ভিন্ন দুই নেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম'। তাই সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদী বহু ঈশ্বরবাদী নয়।

তাহলে অবতার বা দেবদেবীরা কারা? তারাও পূজনীয়। এ কথা ঠিক। কিন্তু অবতার বা দেবদেবীরা ঈশ্বর নন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম অর্থাৎ ন্যায় ও সত্য রক্ষার জন্য ব্রহ্ম যুগে যুগে কোনো না কোনো রূপ ধারণ করেও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্ম রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বলে তাকে বলে অবতার।

আবার ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের এক-একটি শক্তি বা গুণের প্রতীক বা প্রকাশক হলেন একেকজন দেব বা দেবী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেবদেবীরা ঈশ্বর নন ঈশ্বরের এক-একটি গুণ বা শক্তির প্রতীক। যেমন 'দেবী দুর্গা'। দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। আদ্যাশক্তি মহামায়া বা যোগমায়ার মধ্য দিয়েই ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে। এ শক্তি ন্যায় ও সত্যেরও প্রতীক। তিনি অন্যায় ও অসত্যকে ধ্বংস করে ন্যায় ও সত্যের প্রকাশ ঘটান।

একবার মহিষাসুর নামে এক অসুর স্বর্গ ও মর্ত্য (পৃথিবী) দখল করে নিয়েছিল। দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল স্বর্গরাজ্য থেকে। আর দেবতাদের উপায়ও ছিল না। দেবতা ব্রহ্ম মহিষাসুরকে এই বর দিয়েছিলেন যে, কোনো পুরুষ মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে না। মহিষাসুর মনে করল যে, সে কার্যত অমর বরই লাভ করেছে। কোনো পুরুষ তাকে বধ করতে পারবে না তার ধারণায় কোনো নারী এত শক্তি ধরে না যে, সে মহিষাসুরের মতো এত বড় বীরকে হত্যা করতে পারবে। কিন্তু এই বরের মধ্যে একটা ফাঁক ছিল। কোনো পুরুষ মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে না কোনো নারী বধ করতে পারবে না, এমন বর তো দেওয়া হয়নি। অতঃপর সব দেবতার সমস্ত শক্তি সম্মিলিত হলো। দেবতাদের সম্মিলিত শক্তি থেকে আবির্ভূত হলেন দেবী দুর্গা। তিনি মহিষাসুরকে বধ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ফিরে পেলেন তার স্বর্গরাজ্য। স্বর্গে ও পৃথিবীতে শান্তি ফিরে এলো। এ বিজয় থেকেই হলো

বিজয়োৎসব। এরই নাম বিজয়া।

আবার ত্রেতা যুগে লঙ্কার রাজা রাবণ হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল রামের পত্নি সীতা দেবীকে। রাবণকে পরাজিত করে শ্রী রামচন্দ্র পালন করেন বিজয় উৎসব। এ থেকেও পালিত হয় বিজয়া। মহিষাসুরকে বধ করতে দেবীর যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার মধ্যে ভয়ানত যুদ্ধ হয়েছিল চার দিন। তিথির হিসেবে তিথিগুলো ছিল আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী। এ শুক্লা দশমী তিথিতে বিজয় হয়েছিল। এ জন্য এ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিকেই বলা হয় বিজয়া দশমী। দুর্গাপূজার চার দিনের দিন দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে বিজয়া দশমী পালন করা হয়।

দেবী দুর্গা তো অমর। তাহলে তার আবার বিসর্জন কী? হিন্দু শাস্ত্র মতে, দেবীকে পূজার জন্য আহ্বান করে এলে মার্টির প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূজা শেষ হলে দেবীকে বলা হয়, তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো। তখন প্রতিমা থেকে তাকে মুক্ত করা হয়। তখন ওই মাটির প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। সুতরাং বিসর্জন নামে দেবী বা কোনো দেবের ধ্বংস নয়, যে মাটির প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, সেখান থেকে মুক্ত করে, তাকে যথা ইচ্ছা চলে যেতে বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিসর্জন দেওয়া হয় না। দেব বা দেবীর প্রতিমা গৃহেই থাকে। পরবর্তী পূজার আগে (বছরান্তে) পুরাতন প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে নতুন প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কাঠের প্রতিমা হলেও তা নির্দিষ্ট সময়ের পর পরিবর্তন করা হয়। ধাতব কিংবা প্রস্তরের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় না। সেই স্থলে নিত্য পূজা করা হয়।

সুতরাং বিজয়া দশমীর তাৎপর্য হচ্ছে দুটি একটি দেবী দুর্গার বিজয়। অপরটি শ্রী রামচন্দ্রের বিজয়। রামচন্দ্র অকালে দেবী দুর্গার পূজা করে ছিলেন। রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বর্ণনা বাল্মীকির রামায়ণে নেই। তবে অন্য কবিদের রচিত রামায়ণে এবং পুরাণে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বর্ণনা রয়েছে। দেবীর নিদ্রাকালে রাম তাকে জাগ্রত করেছিলেন বলে শরৎকালের দুর্গাপূজায় বোধন নামক দেবীর জাগরণের একটি অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু বসন্তকালের দুর্গাপূজায় এ বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় না। তবে কেবল রামচন্দ্রই যে শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন তা নয়, শরৎকালে দুর্গাপূজার রীতি অনেক স্থানেই প্রচলিত ছিল।

বিজয়া দশমীর আরও একটি তাৎপর্য রয়েছে। হিমালয় রাজকন্যা দেবী দুর্গা বা পার্বতী বা উমা নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছিলেন দেবতা শিবকে শিবের আবাসস্থল কৈলাস পর্বত। সেখান থেকে দেবী দুর্গা বা পার্বতী পিতৃগৃহে আসেন। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন পিত্রালয়ে থাকার পর দশমী তিথিতে পতিগৃহ কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করেন। কণ্যাকে বিদায় জানানোর বেদনায় বিধুর হয়, বিষাদাচ্ছন্ন হয় দশমী তিথি। তাই দশমী তিথি বিষাদের বেদনার।

বাঙালি হিন্দু বাড়িতে বিবাহিত কণ্যারাও বিদায় নিয়ে স্বামীগৃহে চলে যান। এ ক্ষেত্রে দেবী দুর্গার বিদায় বেদনা ও কণ্যার বিদায় বেদনা এক হয়ে যায়। বাঙালি হিন্দুরা মনে করেন, বিজয়া দশমীতে তারা কেবল দেবী দুর্গাকে বিদায় দিচ্ছেন না, যেন নিজের কণ্যাকে বিদায় দিচ্ছেন। এভাবে দেবী হয়ে ওঠেন ঘরের মেয়ে যে নাইওরে এসে, তিন দিন থেকে চার দিনের দিন স্বামীগৃহে ফিরে যান। এভাবে পূজাপার্বণের মধ্যে বাঙালির সমাজ ও যাপিত জীবনের প্রতিফলনও ঘটে। বিজয়া দশমী এমনই একটি ধর্মীয় কৃত্য যার মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের একটি দিকের প্রতিচ্ছায়া উপলব্ধি করা যায়।

দশমীকে 'বিজয়া' বলার কারণ খুঁজলে অনেক পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যাবে। পুরাণের মহিষাসুর বধ কাহিনীতে বলা হয়েছে বলা হয়েছে, মহিষাসুরের সঙ্গে ৯ দিন ৯ রাত্রি যুদ্ধ করার পর দশম দিনে তাঁর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন দেবী দুর্গা। তাই তাকে 'বিজয়া' বলা হয়। এছাড়াও শ্রীশ্রীচণ্ডী কাহিনী অনুসারে, দেবীর আবির্ভাব লাভ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে। পরে শুক্লা দশমীতে মহিষাসুর বধ করেছিলেন তিনি। তাই বিজয়া দশমী এই বিজয়াকেই চিহ্নিত করেন।

উত্তর ও মধ্য ভারতে এই দিনে দশেরা উদ্‌যাপিত হয়। তবে তাৎপর্য সম্পূর্ণ আলাদা। 'দশেরা' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত শ্বদ 'দশহর' থেকে। যার অর্থ দশানন রাবণের মৃত্যু। বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে, আশ্বিন মাসের ৩০ তম দিনে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করেন রাম, সীতা ও লক্ষণ। রাবণ বধ ও রামচন্দ্রের এই প্রত্যাবর্তন উপলক্ষেই যুথাক্রমে দশেরা ও দীপাবলি পালন করা হয়ে থাকে। শুভ বিজয়ায় সকলের মঙ্গল কামনা করি।

তথ্য সংগৃহীত

কৃষির আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য

কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে –

মাসিক **কৃষিকথা** পড়ুন। কৃষিকথা'র গ্রাহক হোন। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫.০০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৫০.০০ টাকা। কৃষিকথায় কৃষি বিষয়ক মানসম্মত লেখা দিন। লেখা পাঠাবার
ই-মেইল ঠিকানা: editor@ais.gov.bd, dirais@ais.gov.bd

কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনুন – বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক অনুষ্ঠানসমূহ নিয়মিত শুনুন। বরগুনা জেলার আমতলিতে স্থাপিত **কৃষি রেডিও** এফএম ৯৮.৮ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১১টা এবং বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সম্প্রচার উপভোগ করুন।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি প্রতিদিন সকাল ৮ টার বাংলা সংবাদের পূর্বে ৭.৪০ মিনিটে ও মাটি ও মানুষ রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে সম্প্রচার করা হয়। নিয়মিত এ অনুষ্ঠান দেখুন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস-এর **ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র ইউনিটের** মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারিত কৃষি বিষয়ক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নিজে দেখুন, অন্যকে দেখতে উৎসাহিত করুন।

সরকারি কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩)

সরকারি **কৃষি কল সেন্টার** হতে কৃষি বিষয়ে সকাল ৭.০০টা হতে রাত ৯.০০টা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে সকাল ৯.০০টা হতে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত তথ্য সেবা ও পরামর্শ পেতে **১৬১২৩** নম্বরে কল করুন।
(শুক্রবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

যে কোন মোবাইল হতে আপনাদের প্রয়োজনীয় তথ্য মাত্র ২৫ পয়সা প্রতি মিনিট খরচে কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) হতে জেনে নিন।

কৃষি যোগাযোগ ও তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন অফিস সময়ে সেবা চালু রয়েছে।

যোগাযোগের ঠিকানা : পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২-৫৫০২৮২৬০
ই-মেইল : dirais@ais.gov.bd, ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd

কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

শারদীয় দুর্গাপূজা ও তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির

W. wbwLj P›`ª miKvi

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজা শুধু বাহ্যিক আচারবিশিষ্ট কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান নয়, পূজা-অর্চনা জীবনের সংগে অতোপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্গাপূজা সকলে মিলে-মিশে পালিত হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে সনাতন ধর্মে বহুবিধ পূজার প্রচলন রয়েছে। দুর্গাপূজা প্রতিবছর দু'বার অনুষ্ঠিত হয়। বসন্তকালে বাসন্তি পূজা ও শরৎকালে শারদীয় পূজা। তবে শারদীয় দুর্গাপূজার গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশী। তাই শারদীয় দুর্গাপূজাকে জাতীয় পূজা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দুর্গাপূজা শুধু বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজা নয়। এ পূজা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাশ্মীরে দেবী দুর্গা, দাক্ষিণাত্যে অম্বা ও অম্বিকা, গুজরাটে হিঙ্গুলা ও রুদ্রাণী, কান্যকুব্জে কল্যাণী, মিথিলায় উমা ও কুমারিকায় কন্যাকুমারী নামে পূজিতা হয়ে থাকেন। এভাবে হিমাচল হতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এবং দ্বারকাপুরী ও বেলুচিস্তানের হিঙ্গলাজ হতে পুরীতে জগন্নাথ ক্ষেত্র পর্যন্ত ভারতবর্ষের সকল স্থানে শারদীয় পূজা বা নবরাত্র নামে পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে যখন দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হয়, ঠিক সেসময় দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা পালন করেন নবরাত্রি উৎসব- সরস্বতী, লক্ষ্মী ও দুর্গাকে একসংগে আরাধনা। প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নয় রাতে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলে নবরাত্রি বলে নামকরণ করা হয়। উত্তর ভারতে দশমীর দিন দশমুণ্ড রাবণের এক বিশাল মূর্তি তৈরি করে রাবণ বধের বিজয়োৎসব পালিত হয়ে থাকে। সারা ভারতবর্ষে দুর্গাপূজা-নবরাত্রি-দশেরা এ তিন নামে শারদোৎসব পালন করা হয়ে থাকে।

দুর্গাপূজা শরৎ এবং বসন্ত দুই ঋতুতে অনুষ্ঠিত হয়। তবে ধুমধামের সাথে শরৎকালেই এই পূজা বেশি হয়ে থাকে। শরৎকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা শারদীয় দুর্গাপূজা নামে এবং বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা বাসন্তীপূজা নামে অভিহিত। বাসন্তীপূজা এখনও প্রচলিত থাকলেও শারদীয় দুর্গাপূজাই আবহমান কাল থেকে মহাসমারোহে উৎসবাকারে পালিত হচ্ছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে মতে- দুর্গতিনাশিনী নারায়ণী। তাঁর স্মরণেই মানবকুলের দুর্গতিনাশ হয়। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে আছে- অতিদুর্গম দুর্গদৈত্যকে সমরে বধ করায় আজ থেকে আমার খ্যাতি হবে দুর্গা নামে। যে আমার শরণ নেবে, তার কখনও দুর্গতি হবে না। দেবী পুরাণে দেবীকে দুর্গে বিরাজমানা দুর্গেশ্বরী বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রচলিত মতে দেবী দুর্গতি ও শঙ্কা হরণ করেন বলে তিনি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীকে কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, পার্বতী, কৌষিকী, বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শাকম্ভরী, শতাক্ষী, ভীমা, ভ্রামরী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। দেবী কবচে এক

দুর্গারই নয়টি নামকরণ করেছেন পিতামহ ব্রহ্মা- শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিধাত্রী। দুর্গার এই নয়টি কায়ব্যূহ মূর্তি একত্রে নবদুর্গা নামে খ্যাত। চণ্ডীতে দুর্গার তিনটি রূপের কথা জানা যায়। দুর্গারূপে দেবী মষিাসুরকে বধ করেন। মধুকৈটভ বধের জন্য আর্বিভূত হন দুর্গার অংশজাতা মহাকালী ও শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন দুর্গারই অংশরূপা কৌষিকী।

দুর্গা বলতে দশ প্রহরণ ধারিণী মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গার পরিবার সমন্বিতা রূপ বহুল প্রচলিত। দুর্গার দশ হাতে দশ প্রহর ধারিণী- ডান দিকের হাতে আছে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্নবাণ, শক্তি আর বামদিকে খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অঙ্কুশ, পরশু। দেবী দুর্গার পদতলে ছিন্নশির মহিষ। দেবীর ডান পা সিংহের পিঠে ও বাম পায়ের বুড়ো আঙুল অসুরের কাঁধে। দেবী মর্ত্যে আগমনের সময় পুত্র-কন্যাসহ চার শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাঁরা হলেন- গণেশ গণশক্তি বা শ্রমশক্তি, দেবসেনাপতি কার্তিক ক্ষাত্রশক্তির অধিদেবতা, লক্ষ্মী ধনশক্তি বা বৈশ্যশক্তি ও সরস্বতী জ্ঞানশক্তি বা ব্রাহ্মণ্যশক্তি।

মহালয়া শব্দটির অর্থ মহান যে আলয় বা আশ্রয়। এদিনেই পিতৃপক্ষের অবসান হয় এবং অমাবস্যার অন্ধকার দূর হয়ে আলোকময় দেবীপক্ষের শুভারম্ভ হয়। এখানে দেবী দুর্গা হলেন সেই মহান আলয় বা আশ্রয়। এ মহালয়ার দিনেই দেবী দুর্গার বোধন হয়। বোধন মানে জাগরণ। পুরাণমতে, ব্রহ্মার নির্দেশমতে পিতৃপক্ষের অবসানে টানা পনেরো দিন ধরে স্বর্গীয় পিতৃপুরুষেরা মর্তের কাছাকাছি আসেন আর তাই এই সময় তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু অর্পন করলে তাঁরা তুষ্ট হন। এই মহালয়ার দিনেই দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করার দায়িত্ব পান ব্রহ্মার কাছ থেকে। ব্রহ্মার বরেই সেই মহিষাসুর মানুষ ও দেবতাদের কাছে অপরাজেয় হয়ে উঠেছিল। ফলে তাকে পরাস্ত করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর একত্রিত হয়ে মহামায়ারূপী যে নারীশক্তি তৈরি করেন, তিনিই হলেন দেবী দুর্গা। দেবী দুর্গা টানা নয়দিন যুদ্ধ করে মহিষাসুরকে বধ করেন। দেবী দুর্গা এই দিনের পরেই অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়েছিলেন। তাই হিন্দুদের মাঝে শুভ শক্তির আরাধনায় মহালয়া তিথির গুরুত্ব অপরিসীম।

দুর্গাপূজা ছয়টি কল্পের বিধান রয়েছে- কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প, প্রতিপদাদি কল্প, ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তম্যাদি কল্প, মহাষ্টম্যাদি কল্প, মহানবমী কল্প। বাংলাদেশসহ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামে এ ষষ্ঠাদি কল্পের প্রচলন রয়েছে। এ কল্প অনুযায়ী ষষ্ঠী তিথিতে সন্ধ্যাকালে বিল্ববৃক্ষের শাখায় দেবী দুর্গার বোধন এবং তারপরে আমন্ত্রণ ও অধিবাস। এদিন পূজা হয় ঘটে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী- এ তিনদিন মৃণ্ময়ী প্রতিমায় পূজা করা হয়। এ তিনদিন দেবীর পূজা সম্পাদন করে দশমী তিথিতে বিসর্জন হয়।

একটি কলাগাছ এবং কাল কচুগাছ, হলুদগাছ, জয়ন্তীগাছের শাখা, বেল, ডালিম, অশোক ডাল, মানকচু ও ধানের শিষ- এ নয়টিকে শ্বেত অপরাজিতার লতাও হলুদ রঙের সুতা দিয়ে বেঁধে নবপত্রিকার পূজা করা হয়। নবপত্রিকার পূজায় ব্যবহৃত নয়টি চারার মধ্যে আছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী-ব্রাহ্মণী, কচুর-কালী, হলুদের- দুর্গা, জয়ন্তীর- কার্তিকী, বেলের- শিবা, ডালিমের- রক্তদন্তিকা, অশোকের- শোকরহিতা, মানকচুর- চামুণ্ডা ও ধানের -লক্ষ্মী।

দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে যে পূজা অনুষ্ঠিত তাকে সন্ধিপূজা বলা হয়। অষ্টমী তিথির শেষ চব্বিশ মিনিট ও নবমীর প্রথম চব্বিশ মিনিট- মোট আটচল্লিশ মিনিটের মধ্যে এ পূজা সম্পাদন করতে হয়। দেবীর বর্ষব্যাপী পূজায় যে ফল, সন্ধির অষ্টমীভাগে একবার পূজা করলে সে-ফলের তুল্য ফল হয়। আর কল্পকাল পূজা করলে যে-ফল হয় সন্ধীর নবমীভাগে পূজা করলে সে-ফল হয়। চামুণ্ডারূপে এ পূজায় দেবীর আবির্ভাব হয়।

কুমারীপূজা দুর্গাপূজার অন্যতম বৈশিষ্ট। দেবী পুরাণে এ পূজার উল্লেখ রয়েছে। সাধারণত ১ বছর থেকে ১৬ বছরের অজাতপুষ্প সুলক্ষণা কুমারীকে পূজার উল্লেখ রয়েছে। এক বছরের কন্যাকে সন্ধ্যা, দু'বছরের সরস্বতী, তিন বছরের ত্রিধামূর্তি, চার বছরের কালিকা, পাঁচ বছরের সুভাগা, ছ'বছরের উমা, সাত বছরের মারিনী, আট বছরের কুঞ্জিকা, ন'বছরের কালসন্দর্ভা, দশ বছরের অপরাজিতা, এগার বছরের রুদ্রাণী, বার বছরের ভৈরবী, তেরো বছরের মহালক্ষ্মী, চৌদ্দ বছরের পীঠনায়িকা, পনেরো বছরের ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোলো বছরের কুমারী অম্বিকা নামে পূজিতা হন। ব্রাহ্মণ অবিবাহিত কন্যা অথবা অন্য গোত্রের অবিবাহিত কন্যাকে নিয়ে পূজা করার বিধান রয়েছে। প্রথমে কুমারীকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানোর পর দুর্গা দেবীর মত সাজিয়ে হাতে দেওয়া হয় ফুল, কপালে সিঁদুরের তিলক এবং পায়ে আলতা। নির্ধারিত সময়ে সুসজ্জিত আসনে বসিয়ে ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। তখন চারদিক শঙ্খ, উলুধ্বনি আর মায়ের স্তব-স্তুতিতে পূজাঙ্গণ মুখরিত থাকে। পূজার সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী যেকোন একদিন কুমারীকে দেবী জ্ঞানে পূজা করার রীতির প্রচলন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'শুদ্ধাত্মা

কুমারীতে দেবী বেশি প্রকাশ পায়। কুমারী পূজার মাধ্যমে নারী জাতি হয়ে উঠবে পূত-পবিত্র ও মাতৃভাবাপন্ন, শ্রদ্ধাশীল।' এ পূজার মাধ্যমে সকল নারীকে ভগবতী বুদ্ধিতে দেখা; শুদ্ধাত্ম কুমারীতে যেহেতু ভাগবতী সত্তার বেশী প্রকাশ তাই কুমারীপূজা।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, দুর্গাপূজার প্রথম প্রবর্তক কৃষ্ণ, দ্বিতীয় বার দুর্গাপূজা করেন স্বয়ং ব্রহ্মা আর তৃতীয়বার দুর্গাপূজার আয়োজন করেন মহাদেব। আবার দেবী ভাগবত পুরাণ অনুসারে জানতে পারি, ব্রহ্মার মানস পুত্র মনু ক্ষীরোধ সাগরের তীরে দুর্গার আরাধনা করে বর লাভে সফল হন।

বাঙালি হিন্দু সমাজে দুর্গাপূজা বেশ জনপ্রিয়তা পায়। কালিকা পুরাণের ঘটনা অনুসরণে ব্রহ্মার পরামর্শে রামের দুর্গাপূজা করার কথা উল্লেখ করেছেন। শক্তিশালী রাবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিজয় নিশ্চিত করতে শরৎকালে শ্রী রাম চন্দ্র কালিদহ সাগর থেকে ১০১টি নীল পদ্ম সংগ্রহ করে দুর্গাপূজা করে তার কৃপা লাভ করেন। তবে দুর্গাপূজার সবচেয়ে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় মার্কন্ডুয়ে পুরাণে। এই পুরাণের মধ্যে তেরটি অধ্যায় দেবীমহাত্ম্যম নামে পরিচিত। বাংলায় শ্রীশ্রী চণ্ডি নামে সাতশত শ্লোক বিশিষ্ট দেবী মহাত্ম্যম পাঠ আছে- যা দুর্গাপূজার প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পূজার আসরে স্থায়ী হয়ে গেছে।

সনাতন ধর্মের আর্য ঋষিরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতীক হিসাবে দেবী দূর্গার আশীর্বাদ লাভের জন্য আরাধনা করতেন। মার্কন্ডুয়ে পুরাণ মতে, চেদী রাজবংশের রাজা সুরথ খ্রিস্ট্রের জন্মের ৩০০ বছর আগে কলিঙ্গে (বর্তমানে ওড়িষ্যা) Duseehera নামে দুর্গাপূজা প্রচলন করেছিল। নেপালে Duseehera বা Dashain নামেই পূজা হয়। পুরাণ মতে, দুর্গাপূজার ইতিহাস আছে কিন্তু ভক্তদের কাছে সেই ইতিহাস বিশ্বাসের।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর চণ্ডীচিন্তার অনুসরণে দুর্গাপূজার দুটি দিক রয়েছে- একটি বাইরের দিক যা বিজ্ঞানধর্মী, অপরটি অন্তরের দিক যা আত্মধর্মী। প্রথমটির উদ্দেশ্য মহাশক্তির সংগে ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধ স্থাপন আর দ্বিতীয়টি যেন মায়ের সংগে সন্তানের যে চিরসম্বন্ধ তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্যে দুর্গাপূজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ঢাকেশ্বরী মন্দির চত্বরে আছে দুই ধরনের স্থাপত্যরীতি মন্দির। ১১শ বা ১২শ শতক থেকে এখানে কালীপূজার সাথে দুর্গাপূজা করার প্রচলন রয়েছে। কারও মতে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে দিনাজপুরের জমিদার প্রথম দুর্গাপূজা করেন। আবার কারও মতে, ষোড়শ শতকে রাজশাহী তাহেরপুর এলাকার রাজা কংশ নারায়ণ প্রথম দুর্গাপূজা করেন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে কুচ বংশের রাজা বিশ্ব সিংহ কুচবিহারে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, ১৬০৬ সালে নদীয়ার ভবনানন্দ মজুমদার দুর্গাপূজার প্রবর্তক। ১৬১০ সালে কলকাতার সুবর্ণ রায় চৌধুরী সপরিবারে দুর্গাপূজা চালু করেন। ১৭১১ সালে অহম রাজ্যের রাজধানী রংপুরের শারদীয় পূজার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের দূত রামেশ্বর নয়ালঙ্কার। নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌল্লার আক্রমণে কলকাতার একমাত্র চার্চ ধ্বংস হবার পর সেখানে কোনো উৎসব আয়োজনের অবস্থা ছিল না। পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ১৭৫৭ সালে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা নব কৃষ্ণদেব লর্ড ক্লাইভের সম্মানে দুর্গাপূজার মাধ্যমে বিজয় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

আধুনিক দুর্গাপূজার প্রাথমিক ধাপ ১৮ শতকে নানা বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগে ব্যক্তিগত, বিশেষ করে জমিদার, বড় ব্যবসায়ী, রাজদরবারের রাজ কর্মচারী পর্যায়ে প্রচলন ছিল। বাংলাদেশের সাতক্ষীরার কলারোয়ার ১৮ শতকের মঠবাড়িয়ার নবরত্ন মন্দিরে দুর্গাপূজা আয়োজন করা হতো। পাটনাতে ১৮০৯ সালের দুর্গাপূজার ওয়াটার কালার ছবির ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে। ওরিষ্যার রামেশ্বরপুরে একই স্থানে ৪০০ বছর ধরে সম্রাট আকবরের আমল থেকে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। বর্তমানে দুর্গাপূজা দুইভাবে হয়ে থাকে- ব্যক্তিভাবে, পারিবারিক স্তরে ও সমষ্টিগতভাবে; পাড়াস্তরে বারোয়ারি বা সর্বজনীন পূজা নামে পরিচিত।

যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে দুর্গাপূজা উৎসবাকারে পালিত হয়ে আসছে। দুর্গা মন্দিরে পূজার সময়কালে ভক্তিমূলক গান, চণ্ডীপাঠ, অর্চনা, আরতি ও ভক্তদের শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানের প্রচলন রয়েছে। সেই সাথে কোলাকুলি, প্রণাম, আশীর্বাদ ও মেলা এসকল আয়োজন দুর্গাপূজাকে উৎসবে পরিণত করে ধর্মীয় আবেশে আনন্দঘন করে তোলে। দুর্গোৎসব মানুষে মানুষে মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিময় ও কল্যাণময় সম্পর্ক। এ উৎসবে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে পারস্পারিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্গাপূজা সর্বজনীন উৎসব এটা শুধু কথার কথা নয়- পূজাবিধি এবং দেবীর প্রতিমার রূপ-কল্পনায়ও এটা পরিলক্ষিত হয়। অন্য সব দেবতা এককভাবে পূজিত হন; কিন্তু দেবী দুর্গা পূজিত হন সমষ্টিগতভাবে।

তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির

২০১৭ সালে অস্থায়ীভাবে তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির স্থাপনের পর প্রথম শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সে বছরেই মা দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন না দিয়ে একাদশ তিথি থেকে নিত্য পূজা শুরু করা হয়। পরবর্তীতে মন্দিরটি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এরপর থেকে প্রতিবারেই দুর্গা মায়ের প্রতিমা বিসর্জন না দিয়ে প্রতিদিন পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গীতা পাঠ ও কীর্তনের আয়োজন করা হয়। এ মন্দিরে গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় দুর্গা মায়ের পূজা-অর্চনা করা হয়। পূজার সময় এলাকার সকল ভক্তবৃন্দ সমবেত হয়ে দুর্গা মায়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। প্রতিদিন পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রতি বছর এ মন্দিরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সমাজের সকল স্তরের জনগণের সহযোগিতায় শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজায় ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সর্বজনীন দুর্গোৎসব হিসেবে সকলের মাঝে গ্রহণ যোগ্যতা পেয়েছে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার দিন সন্ধ্যায় ভক্তবৃন্দ ও এলাকার সর্বস্তরের জনগণ মন্দির সংলগ্ন স্থানে সমবেত হয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। পূজা উপলক্ষ্যে শিশুদের মাঝে ধর্মীয় গান, কবিতা আবৃতি ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রতি বছরেই সরকারের মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ধর্মীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করা হয়। প্রতি বছরেই সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

এ ছাড়াও মন্দিরে প্রতি শনিবার শনিপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জন্মতিথি, রাধাঅষ্টমী, লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবসসহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়ে থাকে। প্রতি শুক্রবার সকালে গীতাপাঠ ও গীতার মাহাত্ম বর্ণনা করা হয়। এছাড়াও ভক্তবৃন্দের নিজস্ব ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য সুযোগ প্রদান করা হয়।

সম্পাদক, অপরাজিতা সংকলন পর্ষদ ও
উপদেষ্টা, তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
গ্রন্থাগার প্রধান, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শৈশবের দুর্গাপূজার স্মৃতি

wPiiÄb miKvi

ছেলেবেলায় আমাদের গাঁয়ে কোনও বারোয়ারি দুর্গাপূজা হতো না। গোটা এলাকা জুড়ে কেবল থানা সদরে অবস্থিত গোবিন্দ-জিওয়ের মন্দিরে হতো দুর্গাপূজা। সত্যি কথা বলতে কী, দুর্গাপূজাটা গাঁয়ের অধিকাংশ মানুষের কাছেই কোনও সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না।

তখন আশ্বিন কিংবা কার্তিক মাস। আমাদের একফসলা জমির দেশে, বৈশাখ মাসের মধ্যেই ধান-চাল ফুরিয়ে যেত অধিকাংশ বাড়িতে। আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্রের মাঝামাঝি অবধি চাষের জমিতে কাজ জুটত মজুরদের। দিনান্তে আধপেটা হলেও জুটত। ভাদ্রের মাঝামাঝি থেকে পুনরায় কর্মহীন হয়ে পড়ত গাঁয়ের বারো আনা মানুষ। তারপর আসত সেই ঘোর আশ্বিন ও কার্তিক-দীর্ঘ দু'দুটো মাস। গাঁয়ের বারো আনা মানুষের ঘরে একদানাও ধান-চাল নেই। মাঠেঘাটে কাজও নেই তিলমাত্র। গোটা ছেলেবেলা জুড়েই দেখেছি, ওই দুটো মাস আমাদের এলাকায় নেমে আসত পুরোপুরি দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। যাকে বলা হতো 'মঙ্গা'। এলাকার বারো আনা মানুষ বলা যায় তখন অনাহারেই দিন কাটাত। বনেবাদাড়ে, পুকুরপাড়ে ঘুরে ঘুরে, কুড়িয়ে-কাড়িয়ে নিয়ে আসত কন্দকচু, শাকপাতা-দিনান্তে ওগুলোই সেদ্ধ করে পেটে পুরত। আর, উপোসি পেটে ওইসব অখাদ্য-কুখাদ্য প্রবেশ করা মাত্রই বাধিয়ে দিত ধুন্ধুমার কাণ্ড। ডায়রিয়া, কলেরা, বমি-উপোসি শরীরগুলো তাতে করে আরও অসাড় হয়ে যেত। এমনকী, নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতেও দেখেছি, কোনওমতে দুটো পয়সা সংগ্রহ করে পরিবারের কর্তাটি দিনান্তে এক সের (তখনও কেজি বা কিলোগ্রাম চালু হয়নি) আটা নিয়ে বাড়ি ফিরল। সেই আটা এক হাঁড়ি জলে ফুটিয়ে বাড়িসুদ্ধ মানুষ এক বাটি করে পেটে পুরে খিদে মেটাত। মনে পড়ে, ওই দিনগুলোতে রোজ দিনই গ্রামের কোনও না কোনও প্রান্ত থেকে কান্নার রোল উঠত। শুনতাম কখনও ঘোষ পাড়ায়, কখনও কুড়ুলিয়ায়, কখনও নয়নকার বা কোনো পাড়ায় শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অকাল মৃত্যুতে কান্না। দিদিমার মুখে শুনতাম, খগেনের বউটা এক নাগাড়ে পাঁচদিন অনাহারে থেকে আজ চলেই গেল ওপারে! বাস্তবিক, আমাদের ছেলেবেলায় প্রত্যেক বছরই ওই দু-আড়াই মাস ভয়াল হয়ে দেখা দিত গোটা এলাকায়।

ঠিক তেমনই পরিস্থিতিতে ফি-বছর আশ্বিন মাসের শেষে বেজে উঠত পূজার ঢাক। উপোসি অর্ধচেতন মানুষগুলো সেই ঢাকের আওয়াজে নিভু নিভু চোখ দুটিকে অতি কষ্টে খুলত। পরমুহূর্তে আবার বুজে আসত চোখ দুটি। বলাই বাহুল্য, ওই পূজায় যোগ দেওয়ার মতো অবস্থায় থাকত না গাঁয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের। তাদের তখন অষ্টপ্রহর চলছে একপেট খিদের সঙ্গে নখে-দাঁতে লড়াই।

ঘোষপাড়ার দয়ালপ্রসাদ শাস্ত্র-পুরাণের গল্প-টল্প অল্পবিস্তর জানতেন। একান্তে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতেন, এমন ঘোর দুর্দিনে পূজা? উৎসব? এটা তো আসল দুর্গাপূজাই নয়। রামচন্দর রাবণ-রাজাকে হারাবার তরে, লঙ্কার বালুচরে অকালবোধন করেছিল। তা, রামচন্দর ছিল রাজার ব্যাটা, তার পক্ষে বছরের সব মাসই পৌষ মাস। একালেও, তার সমকক্ষ যারা, রাজা, জমিদার-তারাই কেবল এমন অসময়ে মেতে উঠতে পারে উৎসবে। এটা হইল রাজা-রাজড়াদের দুর্গাপূজা।

দেখেছি, মহালয়ার পর থেকেই ছকবাঁধা গরুর গাড়িতে চড়ে রোজদিন আসছে সুবর্ণ-বর্ণা, সালঙ্কারা নারীর দল, সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ির বউ-ঝি, আত্মীয়-কুটুমের দল। মেঠো পথে গরুর গাড়ির ঢকচানিতে তাদের সোনার অঙ্গে স্বর্ণালংকারগুলি সুরেলা হয়ে বাজত অবিরাম। অন্তঃপুরচারিণী যুবতীদের কলহাস্য, নিজেদের মধ্যে আড্ডা খুনসুটি করতে করতে মাঝে মাঝেই সুরেলা হাসিতে ভেঙে পড়তেন তাঁরা। এসব দৃশ্য দেখে এলাকার কিশোর-যুবারা স্বপ্ন-মদির চোখে ভাবালুপ হয়ে যেত। অনেকে দেবদাসের মতো দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেন।

হ্যাঁ, অভাব আর দারিদ্র্যের ছবিটাকে সড়িয়ে রাখলে পূজার অন্য ছবিও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় পূজার ক'দিন আমাদের জীবনে ভারী মিষ্টি সুবাস বয়ে আনত। ফি-বছরই পূজার আগে সাধ্যমতো নতুন জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা হতো। বাবা আমাদের সামনে সদ্য কেনা জামা-কাপড়গুলি বের করে দিতেন। আমরা যে যার জামা-কাপড়গুলোকে নিজে নিজের গায়ের সঙ্গে লটকে দিয়ে মাপটা দেখে নিতাম। তারপর, যে যার বিছানায় ওগুলোকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম।

ষষ্ঠী থেকেই শুরু হয়ে যেত আমাদের পূজা-উন্মাদনা। কিছুক্ষণ পর পরই আমরা ঢু-মারতাম মন্দিরে। প্রতিমা এত আশ্চর্য সুন্দর হয়। পূজার তিনদিন সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত অব্দি চলতে ধূপ-ধূনা-প্রদীপসহ আরোতি! সেটাও ছিল একটা বড়

আকর্ষণ।

তখনকার সঙ্গে এখনকার পুজোর দুটো লক্ষণীয় তফাত মনে করিয়ে দিতে চাই।

এক.

তখন মূল আকর্ষণ ছিল প্রতিমা, কিছুটা প্যান্ডেল, আলো ও আরোতি। বিদ্যুতের আলো নয়, হেজাকের আলো! সেই সময় ছেলেদের আর মেয়েদের লাইনের মধ্যে যে বাঁশের বেড়াটা থাকত সেটার বাঁশত্ব ছিল নির্ভেজাল। তাই প্রতিমার মুখ আর ভিড়ে আবছা দেখা কারও মুখের আদল নিয়ে মনে মনে কবি হয়ে যাওয়াটা ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। তবে ভিড়টা উপভোগ করতাম। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে একাত্ম হয়ে গেলে ব্যক্তি 'আমি'র 'আমিত্ব'টা লুপ্ত হয়ে যায়। সেটার বোধহয় প্রয়োজন আছে!

দুই.

পুরাণ-উপপুরাণ অনুসারে শরৎকালে রামচন্দ্র রাবণ বধের আশায় যে পূজা করেছিলেন সেটাই অকাল বোধন। দক্ষিণায়নে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। শরৎকালে শ্রাবণ থেকে পৌষ পর্যন্ত এই কাল। তাই দেবীকে জাগ্রত করতে রামচন্দ্রকে অকাল বোধন করতে হয়। জয়লাভের জন্য তিনি দেবী দুর্গার শরণাপন্ন হন। কেননা, দেবী পাপ, ভয়, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, শত্রু থেকে ভক্তকে রক্ষা করেন। তবে আমরা বাঙালিরা দেবী দুর্গাকে ঘরের মেয়ে বানিয়ে পূজা করি। বাংলায় ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা কংসনারায়ণ দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিন কল্পারম্ভ ও বোধন হয়। তারপর আমন্ত্রণ, তারপর অধিবাস।

এভাবেই নিয়ম মেনে চলে আসছে দুর্গাপূজা। শৈশব ও কৈশোরে আমরা যে পূজা দেখেছি। সেকাল-একালের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য চোখে পড়ে দুটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। একটি কুমারী পূজা, অন্যটি বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠান। শ্রীরামচন্দ্র পূজাকালীন নবমী তিথিতে দেবীকে দর্শন করেন কুমারীরূপে। তিনি তখন তাঁকে পূজা করেন। সেই থেকে নবমীর দিন কুমারী পূজার প্রচলন হয়ে যায়। অবশ্য ভিন্ন মত অনুসারে অষ্টমী তিথিতেও কুমারী পূজার চল রয়েছে। শাস্ত্র অনুসারে এই কুমারীকে হতে

হবে ব্রাহ্মণ কন্যা। কেননা দেবীর বিভিন্ন রূপ কল্পনা করে এই পূজা করা হয়।

যেমন এক বছরের কন্যা সন্ধ্যারূপে, দু বছরের কন্যা সরস্বতীরূপে, তিন বছরের কন্যা ত্রিধামমূর্তিতে, চার বছরের কন্যা কালিকারূপে, পাঁচ বছরের কন্যা সুভগারূপে, ছয় বছরের কন্যা উমারূপে, সাত বছরের কন্যা মালিনীরূপে, আট বছরের কন্যা কুব্জিকারূপে, নয় বছরের কন্যা দেবী সন্দর্ভারূপে, দশ বছরের কন্যা অপরাজিতারূপে, এগারো বছরের কন্যা রুদ্রাণীরূপে, বারো বছরের কন্যা ভৈরবীরূপে, তেরো বছরের কন্যা মহালক্ষ্মীরূপে, চোদ্দো বছরের কন্যা পীঠনায়িকারূপে, পনেরো বছরের কন্যা ক্ষেত্রজ্ঞারূপে, ষোলো বছরের কন্যা অম্বিকারূপে পূজিতা হয়।

এই নিয়ম চলে আসছিল বহুকাল পর্যন্ত। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এই শাস্ত্রনীতি ভঙ্গ করেন। ১৮৯৮ সালে কাশ্মীর ভ্রমণের সময় তিনি এক মুসলমান মাঝির চার বছরের কন্যাকে কুমারীরূপে পূজা করলেন। জাতপাত ও বর্ণের বৈষম্য ঘুচিয়ে তিনি বললেন সব কুমারীর মধ্যেই দেবীর অধিষ্ঠান রয়েছে। ১৯০১ সালে নয়জন কন্যাকে তিনি কুমারী সাজিয়ে পূজা করেন দেবীর নবরূপের কল্পনা করে। ভাবের ঘোরে তিনি নবরূপে দেবীকে দর্শন করেন এদের মধ্যে।

যাহোক, আমাদের কৈশোরে দুর্গাপূজার সবচেয়ে আনন্দের দিন ছিল বিজয়ার দিন। আমরা অপেক্ষা করতাম বিজয়ার রাতের প্রণামির জন্য। আমরা সহস্র সহস্র বছর ধরে বিশ্বাস করে এসেছি যে, মা আমাদের বিজয়দাত্রী। মায়ের কৃপা হলেই জয় পাব, জয়ন্তী, জয়দাত্রী-বিজয়া মায়ের নাম। বিজয়, মানে বিশেষ রূপে জয়। স্ত্রীলিঙ্গে বিজয়া, কারণ বিজয়া একটি

তিথিবিশেষ। পুরাকালে রাজারা এই তিথিতে যুদ্ধযাত্রা করতেন। কারণ এদিন যাত্রা করলে নাকি জয় অবধারিত। মহাবল পদ্ম নামে দৈত্যকে পরাজিত করে দেবী হন বিজয়া, সুরগণকে পরাজিত করে তিনি হয়েছিলেন বিজয়া। বিজয়ার অন্য অর্থ হল পীযূষরূপা। সমুদ্র মন্থনকালে উত্থিত অমৃতের আর এক নাম বিজয়া। অমৃত হল মানুষের শুভশক্তি ও শুভবুদ্ধি। বিজয় উৎসব হল তারই প্রতীক। রাম রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে-বিজয় উৎসব পালন করেছিলেন এই দিনে। আবার মায়ের বিসর্জনের তিথিও হল এই বিজয়া দশমী তিথি।

সেকালের বিজয়ার সূচনা হতো আনন্দঘন মুহূর্ত আর বেদনার মিশ্রণে। মা এসেছেন চার দিনের জন্যে বাপের বাড়ি। বিজয়ার দিন সব অন্ধকার করে তিনি ফিরে যাবেন পতির কাছে। তাই সবার চোখে জল। রাত পোহালেই দশমী। কবি মেনকার কথায় গেয়ে ওঠেন-নবমী নিশি পোহাইও না!

কখনও বা বলেছেন এবার আমার উমা এলে আর মাকে পাঠাব না। একবার রানি রাসমণির জামাই মথুরবাবু বিজয়ার দিনে মায়ের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। তিন দিন পরম আনন্দে কাটাবার পর দশমীর পূজা শেষ করে পুরোহিত খবর দিলেন দর্পণ বিসর্জন হয়েছে। এবার সন্ধ্যাবেলা মায়ের বিসর্জন হবে। মথুরবাবু ঘোরের মধ্যে ছিলেন চমকে উঠলেন। বললেন-না মায়ের বিসর্জন হবে না। আমি এই আনন্দের হাট ভাঙতে দেব না। কেউ যখন বুঝিয়ে পারল না-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে মথুরবাবুর বুকে হাত বুলিয়ে বললেন-মা কি কখনও সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারেন! এতদিন বাইরের দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, এবার সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে পূজা নেবেন। আসল পূজা তো বাইরে নয়, অন্তরে।

বিজয়ার দিন দুপুর বেলায় বড় গামলায় হলুদ জল গোলা রাখা হতো, তাতে দর্পণ দিয়ে তার ভেতর দিয়ে বাড়ির সকলে দেখতেন মায়ের চরণ-যুগল। এবার মায়ের যাত্রাকাল উপস্থিত। উপস্থিত আত্মীয়া, বাড়ির বয়স্কা নারী এয়োতিরা সকলে এগিয়ে আসতেন মাকে বরণ করে বিদায় জানাতে। তাঁদের হাতে থাকত শাঁখ, বরণডালা, মিষ্টি, জল, কনকাঞ্জলির চালের থালা। মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে দিতেন শাঁখা, পলা, লোহা। পাঁচ, সাত, নয়-বিজোড় সংখ্যায় এয়োরা বরণ করতেন উলু দিয়ে। এয়োরা সাজতেন কনের সাজে। বিদায়ক্ষণটা হয়ে উঠত স্বর্গীয়। ঢাকি ঢাকে বোল তুলত-মা থাকবে কতক্ষণ মা যাবে বিসর্জন।

এরপর শুরু হ'ত সিঁদুর খেলা। হোলির মতো ছোটখাট একটা অনুষ্ঠান। মায়ের বিদায় ব্যথা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে সবাই মেতে উঠত আনন্দে। এদিকে দুটো বাঁশের ওপর মার মূর্তি তোলা হতো। আগাগোড়া কাঁধে করে যেতেন মা। শোভাযাত্রা হতো দেখার মতো। পেছন পেছন যেতেন বাড়ির যুবা পুরুষ। মেয়েদের কোনও স্থান ছিল না। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বাড়ির ছেলেরা যেতেন। কর্তার হাতে থাকত মঙ্গলঘট। এর পর কোনো এক পুকুরে মায়ের বিসর্জন হলে মঙ্গলঘটে জল পূর্ণ করে সবাই ফিরে আসতেন বাড়িতে। মঙ্গলঘট রাখা হ'ত বেদিতে বড় পিলসুজে জ্বলত প্রদীপ, শান্তির জল ছিটিয়ে দেওয়া হতো। ছোট ছোট কলাপাতায় লাল কালিতে ডুবিয়ে খাগের কলম দিয়ে লেখা হতো শ্রীদুর্গা নাম। সকাল থেকেই বাড়িতে বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ তৈরির উদ্যোগ শুরু হয়ে যেত। সন্দেশ, নারকেলের নাড়ু, বিভিন্ন ধরনের মোয়া (মুড়ি-চিড়া), খইয়ের মুরকি ইত্যাদি তৈরি হতো। লুচি-লাবড়া, পায়েস, মিষ্টিও তৈরি হতো। দেবী বিসর্জনের পর থেকেই শুরু হয়ে যেত বাড়িতে মানুষের আনাগোনা। যে যেখানে থাকতেন সবাই চলে আসতেন। এসেই ধান-দুর্বাসহ প্রণামের পালা চলত, চলত কোলাকুলি-পূর্বপুরুষদের ছবিতে প্রণাম। প্রণাম মানেই হচ্ছে প্রণামি। আমরা যারা ছোট ছিলাম, তাদের জুটত খুচরো পয়সা। আর বড়দের জন্য টাকা। এরপর পেট পুরে খাওয়া। প্রথমে নাড়ু-খই। তারপর লাবড়া-লুচি-পায়েস-মিষ্টি। যে সব বাড়িতে গেলে প্রণামি মিলতে পারে, আমরা সেসব বাড়িতে গিয়ে হানা দিতাম। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের কাছে তখন খাওয়া কিংবা প্রণাম তখন মুখ্য ছিল না, প্রণামিটাই মুখ্য ছিল!

যদিও এখন আচার-অনুষ্ঠান বদলাচ্ছে। বিজয়ার পর প্রণাম প্রায় নেই বললেই চলে। সময়ের অভাব, ইচ্ছার অভাব, ব্যস্ততার অজুহাতে ফোনেই সব সারা হয়। কেউ কারও বাড়ি মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছে এমন উদাহরণ কম। কারণ সেই আন্তরিকতাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সবাই মিলেমিশে থাকার সেই আনন্দটাই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে, তবে তা সংখ্যায় খুবই কম!

লেখক: উন্নয়ন কর্মী

tas
Total Air Services Limited

HAPPY
DURGA PUJA

WORLD AIRLINE SKYTRAX AWARDS 2022

13 TIMES IN A ROW
BEST LOW-COST AIRLINES IN THE WORLD

DHAKA - KUALA LUMPUR - BANGKOK - SINGAPORE - HONG KONG - JAKARTA - YOGYAKARTA
SURABAYA - BALI - BRUNEI - PHNOM PENH - HO CHI MINH - MANILA - HANOI

BOOK YOUR FLIGHT NOW
+88 01984 555 666
+88 02222275447-8
reservation@totalairbd.com

airasia

"কুমারী পূজা কি? কেন করা হয়"?

মৃত্যুঞ্জয় রায় তপন

কুমারী পূজা হলো তন্ত্রশাস্ত্রমতে অনধিক ষোল বছরের অরজঃস্বলা কুমারী মেয়ের পূজা। আরেকটু স্পষ্ট করে বলা যায়, হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রমতে ষোল বছরের কম বয়সী এমন কণ্যা শিশু, যার আদ্য ঋতু স্রাব হয়নি এবং পুরুষ সংসর্গে যোনি বিদীর্ণ হয়নি। এমন কন্যাকে দূর্গা দেবীর প্রতীকে পূজা করার নাম হলো কুমারী পূজা।

বিশেষত দুর্গাপূজার অংশ হিসেবে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কালীপূজো, জগদ্ধাত্রী পূজা, এবং অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে এবং কামাক্ষাদেবীর শক্তি ক্ষেত্রেও কুমারী পূজার প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে কুমারী পূজার প্রচলন কমে গেছে। শাস্ত্রমতে কুমারী পূজার উদ্ভব হয় বানাসুর বা কোলাসুর নামক অসুর এক সময় স্বর্গ-মর্ত্য অধিকার করায় বাকি বিপন্ন দেবগণ মহাকালীর শরণাপন্ন হন। সে সকল দেবগনের আবেদনে সারা দিয়ে দেবী দেবতাদের আবেদনে সারা দিয়ে দেবী মানব কণ্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পুন জন্মে কুমারী রূপে কোলাসুরকে বধ করেন। এরপর থেকেই মর্ত্যে কুমারী পূজার প্রচলন শুরু হয়। প্রতি বছর দূর্গাদেবীর মহাঅষ্টমী পূজার শেষে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মতান্তরে নবমী পূজার দিন ও কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

কুমারী পূজার দার্শনিক তত্ত্বা

কুমারী পূজার দার্শনিক তত্ত্ব হলো-নারীতে পরমার্থ দর্শন ও পরমার্থ অর্জন। বিশ্ব ব্রহ্মমান্ডে যে ত্রিশক্তির বলে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ক্রিয়া সাধীত হচ্ছে, সেই ত্রিবিধ শক্তিই বীজাকারে কুমারীতে নিহিত। কুমারী প্রকৃতি বা নারী জাতির প্রতীক ও বীজাবস্থা। তাই কুমারী বা নারীতে দেবী ভাব আরোপ করে তার সাধনা করা হয়। পৌরাণিক কল্পকাহিনীতে বর্ণিত আছে। এ ভাবনায় ভাবিত হওয়ার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজের স্ত্রীকে ষোড়শী জ্ঞানে পূজা করে ছিলেন।

বয়সের ক্রমানুসারে কুমারীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়

১. এক বছরের কন্যাকে বলাহয় সন্ধ্যা।
২. দুই বছরের কন্যাকে বলা হয় সরস্বতী।
৩. তিন বছরের কন্যাকে বলা হয় ত্রিধামূর্তি।
৪. চার বছরের কন্যাকে বল হয় কালীকা।
৫. পাঁচ বছরের কন্যাকে বলা হশ সুভগা।
৬. ছয় বছরের কন্যাকে বলা হয় ঊমা।
৭. সত বছরের কন্যাকে বলা হয় মালিনী।
৮. আট বছরের কন্যাকে বলা হয় কুব্জিকা।
৯. নয় বছরের কন্যাকে বলা হয় কালসন্দর্ভা।
১০. দশ বছরের কন্যাকে বলা হয় অপরাজিতা।
১১. এগারো বছরের কন্যাকে বলা হয় রূদ্রাণী।
১২. বারো বছরের কন্যাকে বলা হয় ভৈরবী।
১৩. তেরো বছরের কন্যাকে বলা হয় মহালক্ষী।
১৪. চৌদ্দ বছরের কন্যাকে বলা হয় পীঠনায়িকা।
১৫. পনেরো বছরের কন্যাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞা।
১৬. ষোল বছরের কন্যাকে বলা হয় অন্নদা বা অম্বিকা।

কুমারী পূজায় কোন ধরনের কুমারী পূজা করা যাবে

পুরোহিত দর্পণ ধর্মীয় গ্রন্থে কুমারী পূজার পদ্ধতি এবং মাহাত্ম্য বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনানুসারে কুমারী পূজায় কোন জাতি, ধর্ম বা বর্ণভেদ নেই। দেবী জ্ঞানে যে কোন কুমারীই পূজনীয়। তবে সাধারনত ব্রাহ্মণ কুমারী কণ্যার পূজাই সর্বত্র প্রচলিত হলে ও কোথাও বলা নেই যে ব্রাহ্মণ কণ্যাই কেবল পূজ্য। এক্ষেত্রে এক থেকে ষোল বছর বয়সী যে কোন কুমারী কণ্যার পূজা করা যায়। অনেকের মতে দুই বছর থেকে দশ বছরের কণ্যাদের পূজা করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ইতিকথা

প্রণব কুমার সাহা

অনেক মানুষের মনে শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে বহু প্রশ্ন জাগে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ দেবকী পুত্র না যশোদা পুত্র। কেন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তারিখ জানা যায় না, শ্রীকৃষ্ণ কি আদৌ এসছিলেন এই জগতে? এই রকম বহু প্রশ্ন করেন ভক্তদের। তাই সাধু-গুরু-বৈষ্ণবদের কৃপায় যা জেনেছি, সেটি ভক্তদের উপকারার্থে লেখার চেষ্টা করছি মাত্র।

প্রশ্ন করা জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করেছিলেন আমি কে? কেন আমি ত্রিতাপ দুঃখ পাচ্ছি? আসলে ভগবানের করুণা লাভের একটি সহজ পন্থা ভক্ত সঙ্গে ভগবানের কথা জানা। ভগবানও তার বিভিন্ন লীলার মাধ্যমে আমাদের সুযোগ প্রদান করে রেখেছেন যাতে আমরা ভক্তসঙ্গ লাভ করতে পারি।

আজ থেকে ৫,২৪৫ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই দিন ছিল বুধবার, রোহিনী নক্ষত্র, হর্ষণযোগ, ভাদ্র মাস, কৃষ্ণপক্ষ, অষ্টমী তিথি এবং মধ্য রাত্রি।

জ্যোতিষ বিজ্ঞান অনুযায়ী কলি প্রবেশ করেছে এই জগতে শুক্রবার মাঘী পূর্ণিমার দিন। কারণ এই দিন এই জগৎ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হন। তাই জ্যোতিষ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে খ্রীঃ পূর্ব ৩,১০১ বৎসর + ২,০২২ বৎসর + ১২৫ বৎসর=৫,২৪৮ বৎসর।

দেবকী নন্দন ও যশোদা নন্দনের সঙ্গে কি সম্পর্ক তা ভালভাবে জানতে হলে আমাদের আগে বংশ সম্বন্ধে জানতে হবে এবং তার মাধ্যমে জানতে পারব শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই জগতে এসেছিলেন।

ব্রহ্মার পুত্র অত্রি মুনি, তার পুত্র সোম বা চন্দ্র, তার পুত্র বুধ। বুধের পুত্র পরম্পরায় মহারাজ নহুষ এবং তার পুত্র মহারাজ যযাতি এবং তার পুত্র যদু। তাই কখনও কখনও আমরা বলি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বংশে বা যদু বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

এই বংশ পরম্পরায় একজন ধার্মিক রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল দেবমীঢ়। দেবমীঢ় দুই জনকে বিবাহ করেন। একটি ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করে শূরসেন নামক পুত্র লাভ করেন। আর বৈশ্য কন্যাকে বিবাহ করে পর্জন্য নামক পুত্র লাভ করেন।

পরবর্ততে বৈশ্যকন্যার পিতা নাতি পর্জন্যকে নিয়ে গিয়ে গোপ বংশের যুবরাজ করে দিলেন। পর্জন্য রাজা বরীয়সী গোপীকে বিয়ে করে নন্দীশ্বরে বাস করতে লাগলেন। নারদ মুনির কৃপায় ও লক্ষী-নারায়ণের কৃপায় পাঁচটি পুত্র ও দুই কন্যা লাভ করলেন। পাঁচ পুত্রের নাম উপানন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সুনন্দন ও নন্দন। সর্বগুনে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নন্দ। তাই নন্দ রাজ সিংহাসনে বসলেন। পরবর্তীতে সুমুখ নামক এক গোপের কন্যা যশোদাকে বিয়ে করে নন্দ মহারাজ সুখে বসবাস করতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে এরা হলেন নিত্য ভগবদ জনক-জননী। এসব হলো লীলা।

অন্যদিকে দিবমীঢ় ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করে যে শূরসেন নামক পুত্র লাভ করেছিলেন। তাকে নিজ রাজ্যপদ দান করলেন এবং পরবর্তীতে বিবাহ করে দশটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা লাভ কলেন। বড় পুত্রের নাম হলো বসুদেব এবং বড় কন্যার নাম পৃথা বা কুন্তী যিনি পঞ্চপান্ডবের মা। বসুদেব মথুরার সিংহাসনে উপবিষ্ট উগ্রসেনের ভাই দেককের কনিষ্ঠ কন্যা দেবকীকে বিবাহ করেন। কংস উগ্রসেনের বড় পুত্র তৎকালে সে যুবরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত; তাই কংস ছোট ভগ্নিকে খুব ভালবাসেন শুধু নয়, বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে নিজে রথ চালিয়ে শ্বশুর বাড়ী পৌঁছে দিতে গেলেন। কংসরাজের আদেশে সকলের মহানন্দে উল্লাসে চলছে।

দেবতাগণ দেখলেন, যেভাবে কংস ভগ্নী-ভগ্নীপতির সেবা করছে "প্রভু শ্রীকৃষ্ণ" হলেন ভক্ত প্রিয় তাই তিনি পিতা-মাতার সেবা দেখে প্রসন্ন হয়ে যেতে পারেন।

যখন ধরিত্রী দেবী গোমাতার রূপ ধারণ করে পাপের ভারে অসহনীয় হয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে ছিলেন তখন তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী এমনকি শিবজি সহ গিয়ে ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন তখন 'প্রভু' প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে বলেছিলেন "আমি বসুদেবের পুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করে পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য অসুরদের বিনাশ করব।" এই সব চিন্তা করে দেবতাগণ আকাশ বাণী করে কংসকে বললেন, "হে অবোধ কংস! তুমি যে ভগ্নি দেবকীকে এত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছ তার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে সংহার করবে।" এইভাবে তিন বার ধ্বনি হলো। কংস শ্রবণ মাত্রই অগ্নির মতো জ্বলে উঠল। রথ থেকে নেমে দেবকীর ফুলমালা মণ্ডিত কেশ গুচ্ছ ধরল এবং শানিত তরবারির দ্বারা আঘাত করতে চাইল। বসুদেব তখন সুন্দরভাবে কংসকে বোঝাতে চাইলেন, "দেখুন ভোজরাজ কংস" এই জগতের প্রতিটি জীবকেই

একদিন দেহ ত্যাগ করতে হবে, অতএব মৃত্যুর জন্য ভয় করে কি লাভ? জীব কর্ম ও গুণ অনুযায়ী যে কোন যোনীতে জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, সেই দেহতেই সে একটা সুখ অনুভব করবে। আর আপনি নিজের কানে শ্রবণ করেছেন দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান আপনাকে বধ করবেন, অতএব দেবকীর কাছ হতে কোন ভয়ের কারন নেই। আর এই দেবকীর সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্রই আপনার হাতে তুলে দেব। কংসের মন একটু নরম হল এবং বসুদেবের প্রতিজ্ঞার উপর বিশ্বাস করে মথুরায় গমণ করলেন।

শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ স্বামী গুরুমহারাজ এই প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে বলেছিলেন, বসুদেব এমনভাবে বলেছিলেন, যে সন্তানের কাছ থেকে তোমার ভয়, সেই সন্তান ছাড়া সব সন্তান তোমাকে জন্ম গ্রহণ করা মাত্রই ফিরিয়ে দেব, বসুদেবের সব সন্তান ফিরে পাবো-এটা কংস শ্রবণ করেই আনন্দ পেয়েছিলেন।

পতি বসুদেবের গৃহে এসে দেবকী দেবী কাঁদতে কাঁদতে বললেন। "হে নাথ! জীবনের প্রথম মুহূর্তে এত বিপদ, ভবিষ্যতে না জানি কত বিপদ আছে?" বসুদেব বললেন, "প্রিয়ে, শ্রবণ কর, যে হরির চরণ যোগীগণ শত শত জন্ম ধরে তপস্যা করেও পান না, তুমি বিনা তপস্যায় পুত্র রূপে পাচ্ছ। আর এতটুকু ক্লেশ যদি সহ্য করতে না পার তবে অত বড় দুর্লভ বস্তুকে কি করে পাবে?" দেবকী পতিদেবকে বন্দনা করে স্নানাদি কার্য সমাপ্ত করলেন।

আমরা জানি কংস বসুদেবের ছয় পুত্রকে হত্যা করেছিল। এখন প্রশ্ন আসবে তারা কে ছিল কেনই বা মারা গেল।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন কংসের

পিতা উগ্রসেন তো অসুর ছিলেন না, কিন্তু কংস কি করে অসুর হল এবং কেনই বা তার ছয় জন ভাগ্নেকে নিজের হাতে মারলেন?

এর উত্তর হচ্ছে উগ্রসনের স্ত্রী পদ্মাবতী যখন একদিন ছাদের উপর ভ্রমণ করছিলেন তখন দ্রুমিল নামে এক অসুর মায়াবী শক্তির বলে ছদ্মবেশে এসে সঙ্গ করছিল। তাই উগ্রসেনের সন্তান হওয়া স্বত্ত্বেও কংসের মধ্যে অসুরের স্বভাব ছিল। আর কেন ভাগ্নেদের নিজে হাতে মারলেন? এর উত্তর হচ্ছে একসময় ব্রহ্মা নিজ কন্যার প্রতি কামবশতঃ পিছনে পিছন দৌড়াতে দেখে ব্রহ্মার পৌত্র অর্থাৎ মরীচির ছেলেরা হো-হো করে উচ্চৈস্বরে হেসেছিল। তখন ব্রহ্মা ক্রোধান্বিত হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তোমরা অসুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর।

পরবর্তীতে মরীচির ছয় জন পুত্র হিরণ্যাক্ষের পুত্র কালনেমির পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করে। পূর্ব সংস্কার হিসেবে ভগবানের আরাধনা করতে গেলে হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্বিত হয়ে অভিশাপ দেন তোমরা পিতৃকুলের মর্যাদা লঙ্ঘন করে পিতৃশত্রু শ্রীহরির উপাসনা করতে গিয়েছো তাই তোমাদের মৃত্যু পিতৃ হস্তে হবে। তাই তারা জন্ম নিল একে একে মা দেবকীর গর্ভে এবং কালনেমি জন্ম নিল কংস রূপে। তাই কংসের হাতে তাদের মৃত্যু হয়ে হিরণ্যকশিপুর শাপ থেকে মুক্ত হলেন। সেই কারণে কংস তাদেরকে নিজের হাতে মারলো।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০/২/২৮) মরীচি হচ্ছে মনের অবতার আর মনের ছয়টি পুত্র-কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, এবং মাৎসর্য। এই ছয়টি প্রত্রের বিনাশের পর ভগবানের আর্বিভাবের উপযুক্ত আয়োজন করার জন্য। সপ্তম গর্ভে বলদেব আবির্ভাব হলেন। ভগবানের সর্ববিধ লীলার সহায়ক বলদেব। দেবকী মায়ের গর্ভ স্থান শুদ্ধ করার জন্য বলদেব প্রথমে দেবকীর গর্ভে সপ্তমাস অবস্থান করার পর ভগবানের নির্দেশে যোগমায়া আকর্ষণ করে গোকুলে অবস্থানরতা মা রোহিনীর গর্ভে স্থাপিত করলেন। কিন্তু এই কার্যটি উভয়পক্ষ কাউকেও জানতে দিলেন না। দেবকী দেবীর গর্ভশূন্য দেখে সকলেই আশ্চর্য হলেন।

দেবকী দেবীর এবার অষ্টম গর্ভ সর্ব জগৎ নিয়ন্তা তার গর্ভের মধ্যে আবির্ভূত হলেন।। কংস দেবকী দেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারছে না, কারণ এক মহা তেজপুঞ্জ যেন তাকে দগ্ধ করছে। অলক্ষে

দেব-দেবীগণ এসে মা দেবকী দেবীর গর্ভকে লক্ষ্য করে স্তুতি করতে লাগলেন।

গোকুলে নন্দ মহারাজ ও যশোদা পুত্র কামনায় অনেক প্রকার পূজা তথা তীর্থ ভ্রমণ করলেন। অবশেষে নন্দরাণী গৃহাভ্যন্তরে নারায়ণের কাছে কান্না করতে লাগলেন। অন্যদিকে বড় ভাই বিরাট যজ্ঞ করতে লাগলেন। নন্দ মহারাজ একদিন যশোদা রাণীকে বললেন, "দেখ প্রিয়ে স্বপ্ন মধ্যে বা ধ্যানের মধ্যে কখনও আমি তোমার বক্ষস্থলে এক অবর্ণনীয় শিশুকে তোমার স্তন পান করতে দেখেছি।" যশোদা রাণী বললেন, "হে স্বামী! আমিও দেখেছি কিন্তু লজ্জাবশতঃ তা ব্যক্ত করিনি।" ব্রজেশ্বরী বললেন, "হে দেব! নারায়নের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমরা এক বৎসর দ্বাদশী ব্রত করব।"

সেই সময় দেব-দুন্দুভী ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত হয়ে উঠল। ব্রত সমাপনান্তে স্বয়ং নারায়ণ স্বপ্নে এসে নিত্য পিতা-মাতাকে জানিয়ে দিলেন, তোমরা পূর্বে ধরা ও দ্রোণ ছিলে, পুত্র রূপে আমার সেবা করতে চেয়েছিলে, সেই আশা অতি শীঘ্র পূর্ণ হবে। নারায়ণ এই রূপ বলে অন্তর্ধান হলেন। নন্দ, যশোদা জেগে ওঠলেন এবং আনন্দসিন্ধুতে ভাসতে লাগলেন। অতঃপর অতি হর্ষভরে যমুনায় স্নান করে বহু সাধু-সন্ন্যাসী, এমন কি যারা উপস্থিত ছিলেন সকলকে দান দিলেন। গৃহে ফিরে এসে দ্বারদেশে মহাযোগিনী পৌর্ণমাসি এবং ব্রাহ্মনচারী মধুমঙ্গলকে দেখলেন। তাঁদের গৃহাভ্যন্তরে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন। পৌর্ণমাসি বললেন, অতি শীঘ্র সর্বানন্দ কন্দ কদম্ব স্বরূপ সুন্দর পুত্র হবে।

অনন্তর মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষ প্রতি পদ তিথির রাত্রকালে যখন যশোদা মা শ্রীনন্দ মহারাজের সেবা করেছিলেন, ঐ সময় যশোদা মা এক স্বপ্ন দেখলেন, এক শ্যামবর্ণ বালক পূর্বে যাকে তার বক্ষস্থলে খেলা করতে দেখেছিলেন সেই বালকটিকে এক স্বর্ণকান্তি যুক্ত একটি বালিকা আবৃত করতঃ যেন নন্দ মহারাজের হৃদয় থেকে তার হৃদয়ে প্রবেশ করলেন। এর পর থেকে নন্দ রাণীর গর্ভ চন্দ্রাকলার ন্যায় দিন দিন বাড়তে লাগল। অলক্ষ্যে দেবতাগণ স্তুতি গান করতে লাগলেন। নন্দপূরী সর্বদায় আনন্দময়, গোপ-গোপীগণ সর্বদা বিবিধ বেশভুষাদি সজ্জায় সজ্জিত হচ্ছেন। ব্রাহ্মনগণ, দেবগণ, সাধুগণ সকলেই হরিকীর্তনে মগ্ন থাকলেন।

হরি বংশ গ্রন্থে এইভাবে উল্লেখ আছে, অষ্টম মাস পূর্ণ হলে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি, ভাদ্রমাস, বুধবার হর্ষণযোগ রোহিনী নক্ষত্র মধ্য রাত্রি কাল উপস্থিত হল, একই সময়ে সর্বানন্দময় সচ্চিদানন্দ ভগবান দেবকী দেবীর গর্ভ হতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব বিলাস চতুর্ভুজরূপে মা দেবকী ও বসু দেবের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। ঠিক একই সময়ে গোকুলে শ্রীযশোদার গর্ভ সিন্ধু হতে স্বয়ং রূপ ভগবান দ্বিভুজ নর শিশুর ন্যায় জন্ম গ্রহণ করলেন এবং কয়েক ক্ষণের মধ্যে কন্যা যোগমায়া ও মহামায়ার সহিত জন্ম গ্রহণ করলেন। কিন্তু যশোদা মা কেবল অনুভব করলেন সন্তান হয়েছে, তা পুত্র না কন্যা কিছুই বুঝতে পারলেন না। (শ্রীমদ্ভাগবতম ১০/২/৯ এবং ১০/৫/২ তাৎপর্য)

এই দিকে মা দেবকীর সম্মুখে ভগবান চতুর্ভুজ রূপে দর্শন দিয়ে বলতে লাগলেন, "হে সতী! স্বায়মুভব মন্বন্তরে তুমি পৃশ্নি এবং বসুদেব সুতপা নামক প্রজাপতি ছিলে। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে এই রকম চতুর্ভুজ রূপ দর্শন দিয়েছিলাম। তখন তোমরা আমার ন্যায় পুত্র কামনা করেছিলে, সেই কারনে দিব্য চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিলাম। এখন আমাকে গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহে রেখে এসো। আমি উপযুক্ত সময়ে এসে কংসকে বধ করে তোমাদের যাবতীয় দুঃখ মোচন করব। ভগবান এরূপ বলতে বলতে সামান্য শিশুরূপ প্রকাশ করলেন। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নেওয়া মাত্রই সকল বন্ধনখুলে গেল। প্রহরীরা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হলো। যমুনা পাড় হয়ে বসুদেব নন্দগৃহে এসে নন্দ রাণীর কন্যাটিকে গ্রহণ করে স্ব-পুত্রকে যশোদার কাছে রেখে পুণর্বার সেই পথে মথুরায় ফিরে এলেন। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, বসুদেব কি স্বয়ং কৃষ্ণকে দেখতে পান নি। তার উত্তরে বলা হয়েছে, যোগমায়া নিজ কান্তির দ্বারা আচ্ছাদিত করে রেখেছিলেন এবং মেঘের মধ্যে যেমন সৌদামিনী বিলীন হয় তদ্রুপ বসুদেবের পুত্র নন্দপুত্রে বিলীন হলেন।

বসুদেব মহামায়াকে নিয়ে গেলেন কারন যোগমায়াকে অসুর স্পর্শ করতে পারে না। যোগমায়া গোকোলে থেকে সারা রাত্র পাহারা দিয়ে কাউকে জানতে দিলেন না। রাত্রি শেষ হলে ভগবানও দেখলেন, সকলকে আমি জাগাব। এই বলে ওঁম, ওঁম শব্দে অতি উচ্চস্বরে যেন কেঁদে ওঠলেন। ঐ ধ্বনি সকল গোকুল মন্ডলকে জাগিয়ে দিল। সকলে এসে এমনভাবে আনন্দ উৎসব করতে লাগল, এই উৎসব একমাস ধরে চললো।

সংকলিত ও প্রচারিত

চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব

সঞ্জীব কুমার সাহা

চৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৬--১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন ভারতবর্ষে আবির্ভূত এক বহু লোকপ্রিয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ধর্মগুরু মহাপুরুষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। তিনি গৌড়বঙ্গের নদিয়া অন্তর্গত নবদ্বীপে (অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলা) হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীমতী শচীদেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেমাবতার বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত দর্শনের ভিত্তিতে ভক্তিযোগ ভাগবত দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা ও প্রচারক। তিনি বিশেষত পরম সত্ত্বা রাধা ও কৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পর্যন্ত শ্রীহরি নাম, ভক্তি ও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণ করেন যা শ্রী কলি সন্তরন উপনিষদে ও শ্রীপদ্মপুরাণের হরপার্বতী সংবাদে উল্লেখিত রয়েছে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রকে এই কলিযুগে জড়জগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে পারমার্থিক ধামে যাবার একমাত্র পন্থা হিসেবে গণ্য করা হয়।

হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌঃ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাষ্টক নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্রটিও তারই রচনা। ভাগবত পুরাণের শেষের দিকের শ্লোকগুলোতে রাধারাণীর ভাবকান্তি সংবলিত শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যরূপে প্রেমাবতার প্রহণের কথা বর্ণিত হয়েছে। শ্রীভবিষ্য পুরাণেও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের বিশেষ উল্লেখ আছে। তাঁর জন্মতিথি প্রতিবছর দোলযাত্রার দিনে বাঙালিদের ঘরে ঘরে এবং ভারতের সম্পূর্ণ গৌড়ীয় ভাগবত মত অনুসরণকারীদের বাড়ি ও মন্দিরে গৌরপূর্ণিমা রূপে উদ্‌যাপন করা হয়।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বাশ্রমে নামকরণ 'শ্রীশ্রী বিশ্বম্ভর মিশ্র' করা হয়েছিল। তার গাত্রবর্ণ গৌর ও স্বর্ণালি আভাযুক্ত ছিল বলে তাঁকে 'গৌরাঙ্গ' বা 'গৌরচন্দ্র' নামে অভিহিত করা হত; অন্যদিকে, নিম্ব বৃক্ষের নিচে জন্ম বলে তার মাতা তাঁকে 'নিমাই' বলে ডাকতেন তাই নবদ্বীপ বাসিও নিমাই পণ্ডিত বলে তাঁকে অভিহিত করতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সাহিত্য বঙ্গীয় সন্তজীবনী ধারায় এক নতুন যুগের সূচনা ঘটিয়েছিল। সে যুগে একাধিক কবি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর:- শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (সব থেকে পুরনো এবং প্রমাণিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত্রাবলী), শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের:- শ্রীমদ্ চৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের:- শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণনা ও বঙ্গীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতানুযায়ী, ১৪০৭ শকাব্দের বা ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্য মহাপ্রভু ফাল্গুনী পূর্ণিমার (দোল যাত্রা উৎসব) সন্ধ্যাকালে সিংহলগ্নে চন্দ্র গ্রহণের সময় নদিয়ার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতামাতা ছিলেন প্রাচীন গৌড়বঙ্গে নদিয়া অন্তর্গত নবদ্বীপের অধিবাসী জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবী।

সেন রাজবংশ-এর সময় নবদ্বীপ ছিল বাংলার অন্যতম রাজধানী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বক্তিয়ার খিলজি এই নবদ্বীপ জয় করেই বাংলা জয়ের সূচনা করেন। নবদ্বীপের সমৃদ্ধি বহুকালের, গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ তখন ছিল বাংলাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ স্থান। বাণিজ্য ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করায় বাংলাদেশের নানা অঞ্চল থেকে গুণী জ্ঞানী ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও জীবিকা প্রার্থীদের আগমনে নবদ্বীপ খুবই বড় হয়ে উঠতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যের জন্মের সমকালে দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অশান্তি তেমন ছিল না। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ দেশের শান্তি অক্ষুণ্ন রাখেন।

হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণের শিক্ষিতরা সরকারি চাকরি ইত্যাদি করে অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু অন্য-দিকে আবার দেখা যায় অনুন্নত সমাজের মানুষেরা অবহেলিত হচ্ছিল। ঐশ্বয্যের সঙ্গে দারিদ্র সহাবস্থান করছিল। উচ্চশ্রেণীর জীবনযাপনে "ম্লেচ্ছাচার" প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে জানতে পারি, তখন মানুষ অত্যন্ত ধর্মবিমুখ হয়ে পড়েছিল। ধর্মকর্মের মধ্যে ছিল সারারাত জেগে "মঙ্গলচণ্ডীর গীত" শোনা, মদমাংস দিয়ে "যক্ষপূজা", ধূমধাম করে বিষহরির পূজা আর পুত্রকন্যার বিয়েতে অর্থের অপচয় করা। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে সময়ে সমাজের মধ্যে মূঢ়তা ও উদ্দেশ্যহীনতার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল, যা একদল চিন্তাশীল ও

ভাবুককে বিচলিত করে তুলেছিল। রামানন্দ বসু, রূপ-সনাতনের মত প্রতিষ্ঠিত, ধনী ও অভিজাত উচ্চ বংশের শিক্ষিত হিন্দুরা উদ্দেশ্যহীন ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠার অসারতা অনুভব করছিলেন।

চৈতন্য দেবের মাতামহ ও পিতৃ প্রদত্ত নাম ছিল শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র। কিশোরাবস্থায় তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। প্রথম যৌবনে তিনি ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত। তার প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ ও জ্ঞানার্জন। ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য একটি টোল স্থাপন করেন। তর্কশাস্ত্রে নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল অবিসংবাদিত।

দিগ্বিজয়-কেশবকাশ্মীর নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তরুণ নিমাই তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করেন। জপ ও শ্রী হরির নাম কীর্তনের প্রতি তার আকর্ষণ যে ছেলেবেলা থেকেই বজায় ছিল, তা জানা যায় তার জীবনের নানা কাহিনি থেকে।

তার প্রথম ধর্মপত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী কে বিয়ের পর একবার আদিনিবাস শ্রীহট্ট গিয়েছিলেন তিনি। পূর্ববঙ্গে পর্যটনকালে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটলে তিনি মায়ের অনুরোধে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সাথে পাণিগ্রহণ করেন।

এরপর গয়ায় পিতার পিণ্ডদান করতে গিয়ে পিতা ও প্রথম স্ত্রীর বিয়োগ কাতর নিমাই তার মন্ত্রদাতাগুরু স্বামী ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ পান। ঈশ্বর পুরীর নিকট তিনি শ্রীশ্রীগোপাল অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্ররাজে দীক্ষিত হন। এই ঘটনা নিমাইয়ের পরবর্তী জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলায়

প্রত্যাবর্তন করার পর শিক্ষাভিমানী পণ্ডিত থেকে কৃষ্ণভাবময় ভক্ত রূপে তার অপ্রত্যাশিত মন পরিবর্তন দেখে অদ্বৈত আচার্যের নেতৃত্বাধীন স্থানীয় বৈষ্ণব সমাজ আশ্চর্য হয়ে যান। অনতিবিলম্বে নিমাই নদিয়ার বৈষ্ণব সমাজের এক অগ্রণী নেতায় পরিণত হন। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ উপেক্ষা করে তিনি সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষদের বুকে জড়িয়ে ধরে "হরি বল" ধ্বনি বিতরণ করতেন এবং হরিনাম প্রচারে মৃদঙ্গ (শ্রীখোল)-করতাল সহযোগে অনুগামীদের নিয়ে নবদ্বীপের রাজপথে 'নগর সংকীর্তন'-এ বের হতেন। অত্যাচারী জগাই ও মাধাইকে তিনি ভক্তেরূপে পরিণত করেন। তার প্রভাবে মুসলমান 'যবন' (হরিদাস ঠাকুর) সনাতন ধর্ম ও বৈষ্ণব মত

গ্রহণ করেন এবং নবদ্বীপের শাসক চাঁদকাজী তার আনুগত্য স্বীকার করেন। চৈতন্যভাগবত-এ আছে, জাতিভেদের অসারতা দেখানোর জন্য তিনি শূদ্র রাম রায়কে দিয়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও শিক্ষা

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে কাঞ্চন নগরে স্বামী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হওয়ার পর নিমাই পণ্ডিত শ্রীমন্ কৃষ্ণচৈতন্যদেব ভারতী নাম গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি জন্মভূমি গৌড়বঙ্গ ও নদিয়া ত্যাগ করে কয়েক বছর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান যথা: নীলাচল, দাক্ষিণাত্য, পণ্ডরপুর, বৃন্দাবন আদিতে তীর্থাটন করেন। পথে সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই নামে বারাঙ্গনাদ্বয় এবং ভীলপন্থ, নারেজী প্রভৃতি দস্যুগণ তার শরণ গ্রহণ করে। এইসব স্থানে ভ্রমণের সময় তিনি এতদাঞ্চলের ভাষা (যথা: ওড়িয়া, তেলুগু, মালয়ালম প্রভৃতি) বিশেষভাবে শিক্ষা করেন। এই সময় তিনি অশ্রুসজল নয়নে অবিরত কৃষ্ণনাম জপ ও কঠোর বৈরাগ্য সাধন (আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে কৌপীনসার হয়ে) করতেন। জীবনের শেষ চব্বিশ বছরের অধিকাংশ সময় তিনি অতিবাহিত করেন জগন্নাথধাম পুরীতে। ওড়িশার সূর্যবংশীয় সনাতনধর্মীয় সম্রাট গজপতি মহারাজা প্রতাপ রুদ্রদেব চৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতার রূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মহারাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেব ও তার সংকীর্তন দলের পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছিলেন। জীবনের শেষপর্বে চৈতন্যদেব ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতেন এবং অধিকাংশ সময়েই ভাবসমাধিস্থ থাকতেন ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবারে পুরীধামে ৪৮ বছর বয়সে তার লীলাবসান ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনানুসারে তিনি পুরীধামের জগন্নাথের দেহাভ্যন্তরে লীন হয়ে যান।

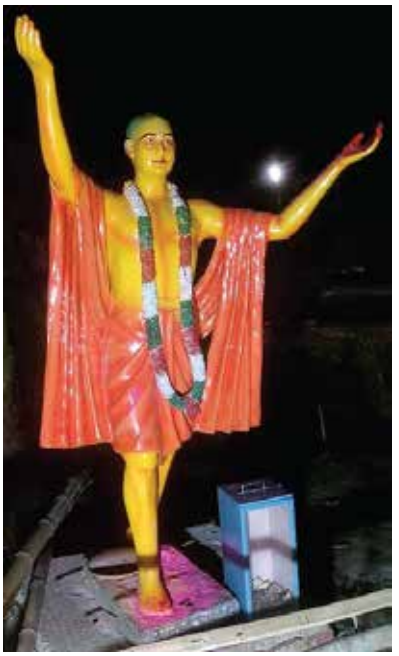

পাদুকা

নবদ্বীপ শহরের মহাপ্রভু ধাম মন্দিরে শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া সমিতির তত্ত্বাবধানে রয়েছে শ্রীচৈতন্যর পাদুকা যুগল। কাঠের এই পাদুকা দু'টি ৫০০ বছর আগে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং মহাপ্রভু। কথিত রয়েছে, শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস নেওয়ার এক বছরের মাথায় শান্তিপুরে এসেছিলেন শচীমাতাকে দর্শনের জন্য। শচীমাতাকে দর্শনের পরেই পুরীধামে চলে যাওয়ার কথা ছিল তার। অচমকা পুরীর যাত্রা বাতিল করে তিনি নবদ্বীপে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীবাস, গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে কীর্তন করতে তিনি নবদ্বীপে চলে আসেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেই সময় বাড়িতে পুজো করছিলেন। সন্ন্যাসীদের স্ত্রীর মুখ দর্শনের নিয়ম নেই। তাই উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মহাপ্রভু। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ঘর থেকে বের হয়ে স্বামীকে প্রণাম করতে যান। প্রণাম শেষ হতেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী দেখেন, এক জোড়া পাদুকা রেখে গিয়েছেন মহাপ্রভু। সামনে মহাপ্রভু নেই। ওই দিন রাতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মায়ের স্বপ্নাদেশ পান, জন্মভিটের নিম গাছ থেকে কাঠের বিগ্রহ তৈরি করে পুজো করতে এবং তার সঙ্গে পাদুকাও পুজো হবে। সেই থেকে মহাপ্রভুর পাদুকা পুজো হয়ে আসছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভাইয়ের বংশধররা ওই পাদুকা যুগল সুরক্ষিত রেখেছেন। ১৯৬০ সালের পর ওই পাদুকা দু'টিকে একটি রুপোর খাপের মধ্যে রাখা হয়।

অবতারত্ব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে, চৈতন্য মহাপ্রভু ঈশ্বরের তিনটি পৃথক পৃথক রূপের আধার: প্রথমত, তিনি কৃষ্ণের ভক্ত; দ্বিতীয়ত, তিনি কৃষ্ণভক্তির প্রবক্তা; এবং তৃতীয়ত, তিনি রাধিকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ কৃষ্ণের স্বরূপ। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চৈতন্য জীবনীগ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তিনি একাধিকবার অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ প্রভুকে কৃষ্ণের মতো বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার গ্রহণের বিষয়ে তিনটি মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল:

১. নিয়মে অবতার গ্রহণ
২. যুগধর্ম প্রবর্তন
৩. কৃষ্ণ প্রেমরস আস্বাদন।

উপদেষ্টা
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

পরপর দুই বছর
দেশসেরা দশ ব্যাংকের তালিকায়
এক্সিম ব্যাংক

টেকসই অর্থায়ন, পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থায়ন, সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম এবং কোর ব্যাংকিং কার্যক্রমে সক্ষমতা বিবেচনায় এক্সিম ব্যাংক-কে দেশসেরা টেকসই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরপর দুই বছর এই তালিকায় স্থান পাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক, গ্রাহকবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে এক্সিম ব্যাংক।

EXIM BANK
শরী'আহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক
অব বাংলাদেশ লিমিটেড

www.eximbankbd.com

সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246

কলিযুগই শ্রেষ্ঠ

বিমল কুমার সাহা

দ্বাপর যুগের শেষভাগের কথা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছে অনেক আগেই। একদিন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের ধর্ম, রাজনীতি, যুগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। পঞ্চপাণ্ডব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরবর্তী যুগ 'কলিযুগ' সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের এক অরণ্যের চারিপাশে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় যেতে বললেন এবং ফিরে এসে প্রত্যেককে তাঁদের দেখা অভিজ্ঞতা তাঁকে জানাতে বললেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশানুযায়ী, পাঁচভাই পাঁচ রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লেন। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন শেষে শ্রীকৃষ্ণের নিকট এসে তাঁদের দেখা অদ্ভূত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।

১. **যুধিষ্ঠীর** তাঁর অদ্ভূত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, তিনি দুই শুড়বিশিষ্ট একটা হাতি দেখতে পেয়েছেন। হাতিটি একটি শুড় দিয়ে খাচ্ছিল এবং অপর শুড়টি নাচাচ্ছিল।

২. **ভীম** বললেন, তিনি দেখেছেন একটি বাছুর তার মা-গাভীর দুধ পান করছে। আর মা-গাভীটি তার বাছুরটিকে চাট্‌ছে। অবাককরা বিষয় হলো, মা-গাভীটির অনবরত চাটার ফলে বাছুরটির পশ্চাৎদেশ রক্তাক্ত হয়ে গেছে--এরপরও মা-গাভী বাছুরটিকে চেটেই চলেছে।

৩. **অর্জুন** তাঁর অভিজ্ঞতায় বললেন, তিনি দেখেছেন একটি শকুন একটা মরা ছাগলের উপর বসে ঠুক্‌রিয়ে ঠুক্‌রিয়ে সেই মরা ছাগলের মাংস খাচ্ছে। কিন্তু অবাক বিষয় যেটা তিনি লক্ষ্য করেছেন তাহলো, শকুনের এক ডানায় বেদবাক্য লিখা আছে।

৪. এবার **সহদেব** বললেন, তিনি এক জায়গায় অনেকগুলি কুয়া দেখেছেন। কয়েকটিতে কিছু পরিমাণজল আছে, আবার কয়েকটিতে কোনো জল নেই। তিনি বিস্মিত এটা দেখে যে, সবচেয়ে গভীরতম কুয়াতে কোন জল নেই।

৫. সবশেষে **নকুল** তাঁর অভিজ্ঞতায় বললেন, তিনি এক জায়গায় দেখেছেন পাহাড় ধ্বসে বড় বড় পাথর খণ্ড পড়ছে। কিন্তু বড় বড় গাছ এবং সেই সমস্ত গাছের মোটামোটা ডালপালার উপর পাথখণ্ডগুলি পড়লেও তাতে পাথরখণ্ডগুলির পতন ঠেক্‌ছে ন। আবার, লতাগুল্মের ঝোপঝাড়েও কোনো কোনো পাথরখণ্ড আটকে যাচ্ছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা শুনলেন এবং বললেন, তাঁদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাই তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং তাতে ভবিষ্যৎ কলিযুগের বৈশিষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন:

১.ক. **যুধিষ্ঠীর**-এর অভিজ্ঞতার তাৎপর্য্যে ভগবান বললেন, কলিযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে হাতির দুইশুড়ের দুরকম কাজের মতো, এযুগের মানুষের স্বভাব হবে দ্বৈত প্রকৃতির। কলিযুগের মানুষ মুখে একরকম বলবে, কাজে করবে অন্যরকম। তাদের এই দ্বিচারিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কেউ কাউকে বিশ্বাস করবে না। ফলে, পারস্পরিক সন্দেহ অবিশ্বাস থেকে সমাজ অস্থিরতা বিরাজ করবে। সমাজ হানাহানিতে লিপ্ত থাকবে। সমাজে শান্তি থাকবে না।

২.খ. **ভীম**-এর অভিজ্ঞতার তাৎপর্য্য তুলে ধরে ভগবান বললেন, কলিযুগের মা-বাবাগণ তাদের সন্তানদের মা-গাভীর ন্যায় অন্ধস্নেহে লালন করবে। মা-বাবার অন্ধ স্নেহের প্রশ্রয়ে সন্তানরা ধর্মপথে না যেয়ে কুপথে ধাবিত হবে। তারা মা-বাবার অবাধ্য হবে। এরা প্রকৃত জ্ঞানে জ্ঞানী না হয়ে কুশিক্ষার, অনুকরণপ্রিয় ও পরনির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

৩.গ. **অর্জুন**-এর বেদবাক্য লিখা ডানা সম্বলিত শকুনের মরা ছাগলের মাংস খাওয়ার অভিজ্ঞতার তাৎপর্য্যে ভগবান বললেন, কলিযুগে ভণ্ড ধার্মিকের ছড়াছড়ি থাকবে। ধার্মিক ও পণ্ডিত হিসেবে সমাজে যাদের প্রভাব প্রতিপত্তি থাকবে তারা অনেকেই সেই প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে নিজের এবং গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যপৃত থাকবে। ফলে সমাজে প্রকৃত ধর্মের, ন্যায়নীতির চর্চা না হয়ে স্বার্থপরতা চর্চা প্রাধান্য পাবে।

৪.ঘ. **সহদেব**-এর জলশূন্য কুয়া দেখাকে কলিযুগে ধর্মশূন্য সমাজের প্রতিচ্ছবি উল্লেখ করে ভগবান বলেন, কলিযুগে ধর্ম-মন্দির এসবের চেয়ে অর্থসম্পদ, বিত্তবৈভব প্রাধান্য পাবে। মানুষের বড় বড় অট্টালিকা থাকবে, প্রচুর ধনসম্পদ থাকবে। কিন্তু সমাজে ধর্মচর্চা থাকবে না। মন্দিরে, যজ্ঞে, উপাশনালয়ে মানুষের আগ্রহ থাকবে না। সৎ পথ ছেড়ে অসৎ পথে মানুষ ধাবিত হবে। ফলে সমাজে পাপাচার বেড়ে যাবে।

৫.ঙ. সবশেষে **নকুল**-এর পাহাড় ধ্বসের অভিজ্ঞতাকে ভগবান খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নকুলের পাথর খণ্ড পতনের সঙ্গে কলিযুগে পাপাচারে নিমজ্জিত মানুষের অনিবার্য্য পতনের ইঙ্গিত বলে উল্লেখ করেন।

ভগবানের মুখে কলিযুগের এহেন মর্মান্তিক বৈশিষ্ট্য শুনে পঞ্চপাণ্ডব খুবই দুঃখ পেলেন এবং হতাশা ব্যক্ত করলেন। এ প্রেক্ষিতে কলিযুগে মানুষের মুক্তির উপায় জানতে চাইলে ভগবান নকুলের দেখা লতাগুল্মের ঝোপে বড় পাথর আটকে যাওয়ার ইতিবাচক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, কলিযুগের মানুষ দ্বৈত প্রকৃতির, অন্ধ স্নেহে মত্ত, ভণ্ড ধার্মিক, বিত্ত বৈভবে ব্যস্ত এবং পাহাড় সমান পাপের বোঝায় নিমজ্জিত থাকলেও শুধুমাত্র আমার (কৃষ্ণনাম) নামের মহিমায় পাপমুক্ত হয়ে উদ্ধার হয়ে যাবে। পঞ্চপাণ্ডবের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদাত্তকণ্ঠে বলেন, কলিযুগে আমি নিজে ভগবান নয়, একজন কৃষ্ণভক্ত হিসেবে ধরাধামে আবির্ভূত হবো এবং কৃষ্ণনামের মাহাত্ম প্রচার করবো। পাপাচারে নিমগ্ন নিকৃষ্ট কলিযুগের মানুষ ধ্যান, যজ্ঞ, পূজাঅর্চনা এবং কঠিন কোনো তপস্যা ছাড়াই শুধুমাত্র কৃষ্ণনামের মহামন্ত্র যপ করে পাপমুক্ত হবে এবং মহামুক্তি লাভ করবে। ভগবান আরও বলেন, সহজ ধর্ম পালনের মাধ্যমে মহামুক্তি লাভের জন্য কলিযুগ হবে--উৎকৃষ্ট যুগ।

কলিযুগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে যেয়ে মহর্ষি বেদব্যাস কলিযুগকে 'শ্রেষ্ঠ যুগ' বা 'যুগশ্রেষ্ঠ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যান্য মুণি-ঋষিদের নিকট নিকট তার এ বক্তব্যের ব্যখ্যায় তিনি বলেছেন--জীবনের পরম মোক্ষলাভের যে ফল সত্যযুগে দশবছর কঠিন তপস্যা, ব্রম্মচার্য ও পূণ্যকর্মে মিলতো, সেই একই ফল ত্রেতা যুগে এক বছর, দ্বাপর যুগে--একমাস আর কলিযুগে তা 'একদিন-রাত্রে'ই প্রাপ্ত করা সম্ভব। আবার, যে ফল সত্যযুগে কঠিন তপস্যা, ত্রেতাযুগে মহাযজ্ঞ এবং দ্বাপরযুগে একনিষ্ঠ পূজা-অর্চনা করে প্রাপ্ত করা যেতো, সেই একই ফল কলিযুগে শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমেই প্রাপ্ত করা সম্ভব।

আমরা বর্তমানে কলিযুগের বাসিন্দা, কৃষ্ণপূরাণ মতে এযুগের বয়স প্রায় চারলক্ষ বত্রিশ হাজার বছর। আমরা বর্তমানে এযুগের প্রায় প্রথমভাগ অতিক্রম করছি। দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবদের কলিযুগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কলিযুগের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তার বক্তব্যের হুবুহু প্রতিফলন আমরা সেই সময় থেকে হাজার হাজার বছর পরও সমাজের সকল কিছুতেই প্রকটভাবে দেখতে পাই। আবার, কলিযুগের উৎকৃষ্টতার বিষয়ে তার বক্তব্যের সত্যতাও আমরা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে খুঁজে পাই। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁর দীবদ্দশায় শুধুমাত্র কৃষ্ণনামের মহামন্ত্রই প্রচার করে গেছেন। তাঁর সারাজীবনের প্রচারের মূল বিষয়ই ছিল, 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম। কল্পনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

অর্থাৎ--কলিযুগে সদ্গতির একমাত্র উপায়ই হলো হরির নাম মহামন্ত্র। আমরা যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী আমরা জানি, আমাদের মুণি-ঋষীদের বাণী কখনো মিথ্যা হয় না। তাই আসুন, আমরা বেদব্যাস মুণির শ্রেষ্ঠ যুগ কলিযুগের সুবিধা নিয়ে এবং পরমেশ্বর ভগবানের 'উৎকৃষ্ঠ যুগ' কলিযুগের মহামন্ত্রে (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) উজ্জীবিত হয়ে জীবনের পরম মোক্ষলাভের জন্য আমরা কৃষ্ণনাম যপ করি এবং কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবন গড়ি।

উপদেষ্টা
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

যুগধর্ম

mwÄe Kzgvi `vm

শ্রীভগবান সর্ব্বব্যাপী চেতনসত্ত্বারূপে সর্ব্বকাল অবস্থিত আছেন। যা কিছুর অস্তিত্ব আমরা এখানে উপলব্ধি করছি সব কিছুর ভিতরেও তিনিই বাস করছেন। তিনিই একমাত্র আদি শাশ্বত সনাতন বস্তু। তাঁকে বুঝবার উপায় হিসাবে শ্রীমদ্ভাগবত মুখে বলছেন-

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বা পরম তত্ত্ববস্তুকে প্রধানতঃ তিনটি স্বরূপে জানতে পারা যায়। প্রথমতঃ সর্ব্বব্যাপী জ্যোতিরূপে বিরাজমান ব্রহ্মস্বরূপে, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত জীবের হৃদয়ে ও তাঁর সৃষ্টির সর্ব্বত্র অনু পরমাণু আদি পর্যন্ত পরমাত্মারূপে, তৃতীয়তঃ স্বধামে গোলক বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বা স্বয়ং ভগবানরূপে।

কর্ম্মযোগে পরমাত্মা জ্ঞানযোগে ব্রহ্ম এবং ভক্তিযোগে ভগবান্ লক্ষিত হন। মুলতঃ ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান একই তত্ত্ব। যিনি যেরূপ ও যতদুর দেখতে সামর্থ্য হন, তিনি তাঁকেই সর্ব্বোত্তম বলে স্থির করেন।

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে -
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ
সর্ব্বকারণকারণম্।।

সৎ-চিদ্-আনন্দময় বিগ্রহ স্বরূপ কৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্। সমস্ত অনাদি বস্তুরও তিনিই আদি। তিনি ইচ্ছাময় সর্ব্বকারণের কারণ স্বরূপ। শাস্ত্রেতে তিনি গোবিন্দ নামে উক্ত।

সেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছাতেই তাঁর নিজের থেকে অনন্তকোটি ব্রহ্মাও সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, প্রলয়াদিরূপ বিশাল কর্মযজ্ঞ অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে। তন্মধ্যে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ নামক চারটি যুগ বা কাল বা সময় যে চক্রাকারে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এক একটি যুগে আধ্যাত্মিক জীবন যাত্রার পরিবেশ যা ভগবৎ ইচ্ছায় নিরূপিত হয়েছে তাহা যুগধর্ম নামে খ্যাত। সেই বিষয়ে যৎ কিঞ্চিৎ আলোক্পাত করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

সত্যযুগ

সত্যযুগ তপ, শৌচ, দয়া ও সত্য - ধর্মের এই চারটি পাদ বর্তমান ছিল। তখন সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিল বলে, সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণাবলী প্রকাশ পেত এবং লক্ষাধিক বৎসর জীবিত থাকতে পারত। তখনকার মানুষেরা হাজার হাজার বছর ধরে ভগবান বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন থাকত। তখন যুগাবতার অবতীর্ণ হয়ে বিষ্ণুর ধ্যান ও তপোধর্মে শিক্ষা প্রবর্তন করতেন। সত্যযুগের যুগাবতার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/২১) বলা হয়েছে-

কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো
বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্,
বিভ্রদ্দন্ডকমন্ডলু।।

সত্যযুগে ভগবান, শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত অক্ষমাল্য, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক, ব্রহ্মচারিবেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সে যুগের তারকব্রহ্ম নাম ও তাঁর মহিমা হল এই যে,-

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণ পরা গতি।।

এই মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরম গতি - এই বিষয়ের চরম আশ্রয়স্থল শ্রীনারায়ণ। ঐশ্বর্যগত পরব্রহ্মের নামই শ্রীনারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও পার্ষদসকল যে বর্ণিত আছে, তাতে নারায়ণরূপ ভগবদ্ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ শান্তের ও কিয়ৎ পরিমাণে দাস্যের উদয় দেখা যায়।

ত্রেতাযুগ

যুগের বিপর্যয়ের ফলে ত্রেতাযুগে ধর্মের একটি পাদ বিনষ্ট হয়। তখন যাগযজ্ঞ আদির দ্বারা সেই যুগের মানুষেরা ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করতেন। কিভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হবে, তা শিক্ষাও প্রবর্তনের জন্য বিশেষ যুগাবতারের আবির্ভাব হত। যুগাবতার নিজেই যজ্ঞ আদির অনুষ্ঠান করে মানব-সমাজকে অনুপ্রাণিত করতেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/২৪) বলা হয়েছে-

ত্রেতায়ং রক্তবর্ণোহসৌ
চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা
স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ।।

ত্রেতাযুগে, রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণ মেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশবিশিষ্ট, বেদত্রয়প্রতিপাদিত বিগ্রহ, স্রুক-স্রুব প্রভৃতি চিহ্নধারী ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্ম নাম ও তাঁর মহিমা হল এই যে-

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হবে বৈকুণ্ঠ বামন।।

এটি ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্ম নাম। এই মন্ত্রে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাতে ঐশ্বর্যগত নারায়ণের বিবিধ বিক্রমসকল সূচিত হয়েছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্যরসযুক্ত এবং কিছু পরিমাণে সখ্যের আভাস দান করছে।

দ্বাপরযুগ

দ্বাপরযুগে ধর্মের দুটি পাদ বিনষ্ট হয়। তখনকার যুগের মানুষেরা রত্নখচিত মন্দিরে আড়ম্বরের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করতেন। এই যুগে যুগে যুগাবতার তাঁর বৈশিষ্ট্য সহ অবতীর্ণ হয়ে জনসাধারণকে অর্চ্চন প্রণালী শিক্ষা দিতেন, যাতে তাঁরা মায়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে ফিরে যেতে পারেন। দ্বাপর- যুগের যুগাবতার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/২৭) বলা হয়েছে-

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ
লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ।।

দ্বাপরযুগে ভগবান্ পীতবসন, চক্রাদি নিজ আয়ুধসমূহ, শ্রীবৎস- প্রভৃতি চিহ্ন এবং কৌস্তভ প্রভৃতি লক্ষণে বিভুষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নাম ও তাঁর মহিমা হল এই যে–

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।।

এই মন্ত্রে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপী শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হয়। এতে শান্ত, দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য – এই চারটি রসের প্রাবল্য দেখা যায়।

কলিযুগ

কলিযুগে 'তপ', 'শৌচ', 'দয়া' – ধর্মের এই তিনটি পাদ-ই নেই, তাই এই যুগ অত্যন্ত অধঃপতিত ও পাপ-পঙ্কিলময়। এই যুগের মানুষেরা মন্দভাগ্য ও কলহপ্রিয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/১০) বলা হয়েছে–

প্রায়েণাল্পায়ূষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ।।

"এই কলিযুগের মানুষেরা প্রায় সকলেই অল্পায়ু। তারা কলহপ্রিয়, অলস, মন্দগতি, ভাগ্যহীন এবং সর্বোপরি তারা নিরন্তর রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত।" কলিযুগ হচ্ছে দোষের নিধি বা সমুদ্র, কিন্তু একটি মহান গুণ আছে। সেই সম্বন্ধে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন–

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধ পরং ব্রজেৎ।।
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।
(ভাগবত ১২/৩/৫১-৫২)

"হে রাজন্! যদিও কলিযুগ দোষের সমুদ্র, তবুও এই যুগে একটি বিশেষ গুণ আছে – শুধুমাত্র 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করে, যে-কেউ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত ভগবৎ-ধামে উন্নীত হতে পারে। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানের মাধ্যমে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমে এবং দ্বাপরে অর্চনের মাধ্যমে যে ফল লাভ করা যেত, সেই একই ফল লাভ করা যায় কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তনে।"

অন্যান্য কলিযুগে যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হন এবং যুগধর্ম প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই বিশেষ কলিযুগে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রেমভক্তি রসসুধা আস্বাদন করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীমতী রাধারানীর ভাব ও কান্তি অবলম্বন করে ৫২২ বছরে পূর্বে শ্রীধাম নবদ্বীপের মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই মহাপ্রভু যদিও নিজের প্রেমভক্তি রসসুধা আস্বাদন করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি কলিযুগের যুগধর্ম 'নাম-সংকীর্তন' প্রবর্তন করে যুগাবতারের কার্যটিও সম্পাদন করেছিলেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২) বলা হয়েছে-

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং
সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।

যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়-কীর্ত্তন পর কৃষ্ণোপদেষ্টা অথাব 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধান তৎপর, যাঁহার 'অঙ্গ' – শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈতপ্রভুদ্বয় এবং 'উপাঙ্গ'– তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার 'অস্ত্র'– হরিনামশব্দ এবং পার্ষদ–শ্রীগদাধর-দামোদরস্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি, যিনি কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীত (গৌর), সেই অন্তকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীমদ্গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।

এই কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম ও তাঁর মহিমা হল এই যে–

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এটি সর্বাপেক্ষা মাধুর্যপর নাম। সমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতাই এর মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই মহামন্ত্রের মধ্যে ভগবানের কোনও প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতাদের পরিচয় নেই। কেবল আত্মা যে পরমাত্মা কর্তৃক কোনও অনির্বচনীয় প্রেমসূত্রে আকৃষ্ট আছেন, তাই মাত্র ব্যক্ত হয়েছে। অতএব মাধুর্য-রসের জনগণের সম্বন্ধে এই নামটি একমাত্র মন্ত্রস্বরূপ হয়েছে। এটির সর্বক্ষণ আলোচনাই একমাত্র

উপাসনা। সারগ্রাহী জনগণের যাগযজ্ঞ, ব্রত, অধ্যায়ন আদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলনই এই নামের অনুগত। এই নাম অনুশীলনে দেশ-কাল পাত্রের বিচার নেই। যে-কেউ যে-কোনও সময়ে এই মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে তার সুফল লাভ করতে পারে।

এই হরিনাম মহামন্ত্র চিন্ময় বস্তু, তাঁর শক্তির তুলনা এজগতের কোন কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়। এই শব্দ-ব্রহ্ম জীবকুলকে সব থেকে নিচু স্তর থেকে তুলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ভগবদ্ধামে সেবা পর্যন্ত দিতে পারে। অর্থাৎ গোলক-বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পদযুগলে নিত্যকাল সেবাধিকার সম্ভব। এই তারকব্রহ্ম নামের শক্তি অতুলনীয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন–

যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম-সংকীর্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন।।
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি 'আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে।।
আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়।।

বৈকুণ্ঠে রয়েছে আড়াইটি রস–শান্ত, দাস্য ও অর্ধ সখ্য এবং এগুলি ঐশ্বর্য মিশ্রিত। কিন্তু গোলোকে রয়েছে পাঁচটি রস–শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এবং এগুলি মাধুর্য-মিশ্রিত। ব্রজের প্রেমভক্তির রস লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। একমাত্র মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপায় তা লাভ করা যায়। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সেই দুর্লভ প্রেমভক্তি দান করতে এসেছিলেন, যা ইতিপূর্বে অন্য কোনও অবতার দান করেননি। সেই সম্বন্ধে বিদগ্ধ মাধবে বলা হয়েছে–

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং
স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরি পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ
শচীনন্দনঃ।।
"পূর্বে যা কখনও অর্পিত হয়নি, সেই উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী নিজের ভক্তিসম্পদ দান করার জন্য যিনি করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত, সেই শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হোন।"

এই কলিযুগ অভ্যন্ত অধঃপতিত হলেও মহাপ্রভু অত্যন্ত দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রদান করেছেন, যা সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর-যুগেও লাভ করা যায় না। সেই জন্য অন্যান্য যুগের লোকেরা এই বিশেষ কলিযুগে জন্মগ্রহণের জন্য প্রার্থনা করেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩৮) বলা হয়েছে–

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি
নারায়ণপরায়ণাঃ।।

"সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের নরগণ কৃষ্ণভক্ত হবার মানসে কলিতে জন্ম লাভের প্রার্থনা করেন।" আর তারা হরিনাম সংকীর্তনকে আশ্রয় করে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করতে চান। সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বর্তমান এই কলিযুগে যাঁরা মানবজন্ম পেয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান্। তাই শ্রীমদ্ভাদবত (১১/২/২৯) বলা হয়েছে–

লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।।

"বহু জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হয়েছে, তাই এটি অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি যে পর্যন্ত না মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করবেন।"

চুরাশি লক্ষ প্রকার গর্ভ ভ্রমণ করে আমরা এই দুলর্ভ মানবজীবন প্রাপ্ত হয়েছি। অন্যান্য নিম্নজন্মেতে আমরা শুধু আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা ও ইন্দ্রিয় তর্পণে নিমগ্ন থেকে সময়গুলি নষ্ট করেছি। কিন্তু বহু জন্ম বাদে এই সুদুর্লভ মানবজীবন পেয়েও যদি আমরা সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি করি, তা হলে মৃত্যুর পরে পরবর্তী জন্মে পশু-পক্ষী-ক্রিমিকীট জীবনে নেমে যেতে হবে। তখন আর দুঃখের শেষ থাকবে না। সেই জন্য বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন এই মানবজীবন লাভ করে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু লাভের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহী হতে হবে। কারণ যেই ব্যক্তি যা পাবার জন্য প্রচেষ্টা করেন, সমস্ত বাসনা পুরণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাই দান করেন।

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে বার বার।
কলিযুগে – কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন সার।।
কলিযুগে যুগধর্ম্ম – নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার।।
(চৈঃ চঃ)
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা।।
বৃহন্নারদীয় (৩৮/১২৬)

কলিযুগেতে হরিনাম বিনা জীবের অন্য কোন গতি নাই; অন্য কোন গতি নাই; অন্য কোন গতি নাই, নিরন্তর হরিনামই একমাত্র গতি। 'হরের্নাম' শব্দটি তিনবার বলার তাৎপর্য এই যে, কোন বিশেষ কাজ নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করার জন্য আমাদের সমাজে কাকতালীয় অনুসারে যে বৈদিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে তাতে গুরুত্ব অর্পণ করা। 'কেবলম্' অর্থে নিরন্তর অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ। চব্বিশ ঘন্টার প্রতিটি

মিনিট, সেকেন্ডসহ শ্রীহরিকে স্মরণ করতে বলা হচ্ছে। এবিষয়ে শাস্ত্রেতে নির্দিষ্ট হয়েছে, "স্মার্ত্তব্য সততং বিষ্ণুং বিস্মার্ত্তব্য ন জাতুচিৎ।" অর্থাৎ অহনিশি বিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিৎ কখনও তাঁকে ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়, এটাই শাস্ত্রবিধি। মহাপ্রভু আর একটু বিস্তৃতভাবে বুঝিয়েছেন, "কি শয়নে কি ভোজনে কিম্বা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত্য কৃষ্ণ বলহ বদনে।।" আমাদের গুরুবর্গেরা বিষয়টিকে আরও বিশদভাবে উন্মোচন করেছেন, ঈশ্বর কেন্দ্রিক সংসার করতে বলেছেন সকলকে। সংসারের কেন্দ্রে রাধাকৃষ্ণকে প্রভু জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদেরকে দাসাভিমানে নির্বাচিত করে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করতে বলেছেন। এতে সব থেকে বেশী লাভজনক, নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি হয়। এই সুলভ পন্থায় হরিনাম করলে অভিষ্ট সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

(সংগৃহীত)

শারদয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা

দৈনিক **স্বদেশ বিচিত্রা** পড়ুন

বিজ্ঞাপন দিন।

অশোক ধর

সম্পাদক

দৈনিক স্বদেশ বিচিত্রা

১৫১, মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

মোবাইল: ০১৮১৮-২১৪৭৫১, ০১৬৭৯-২৮৩৮৫৮

ই-মেইল: dailyswadeshbichitra@yahoo.com

ওয়েব সাইট: www.dailyswadeshbichitra.com

www. epaper.dainikswadeshbichitra.com

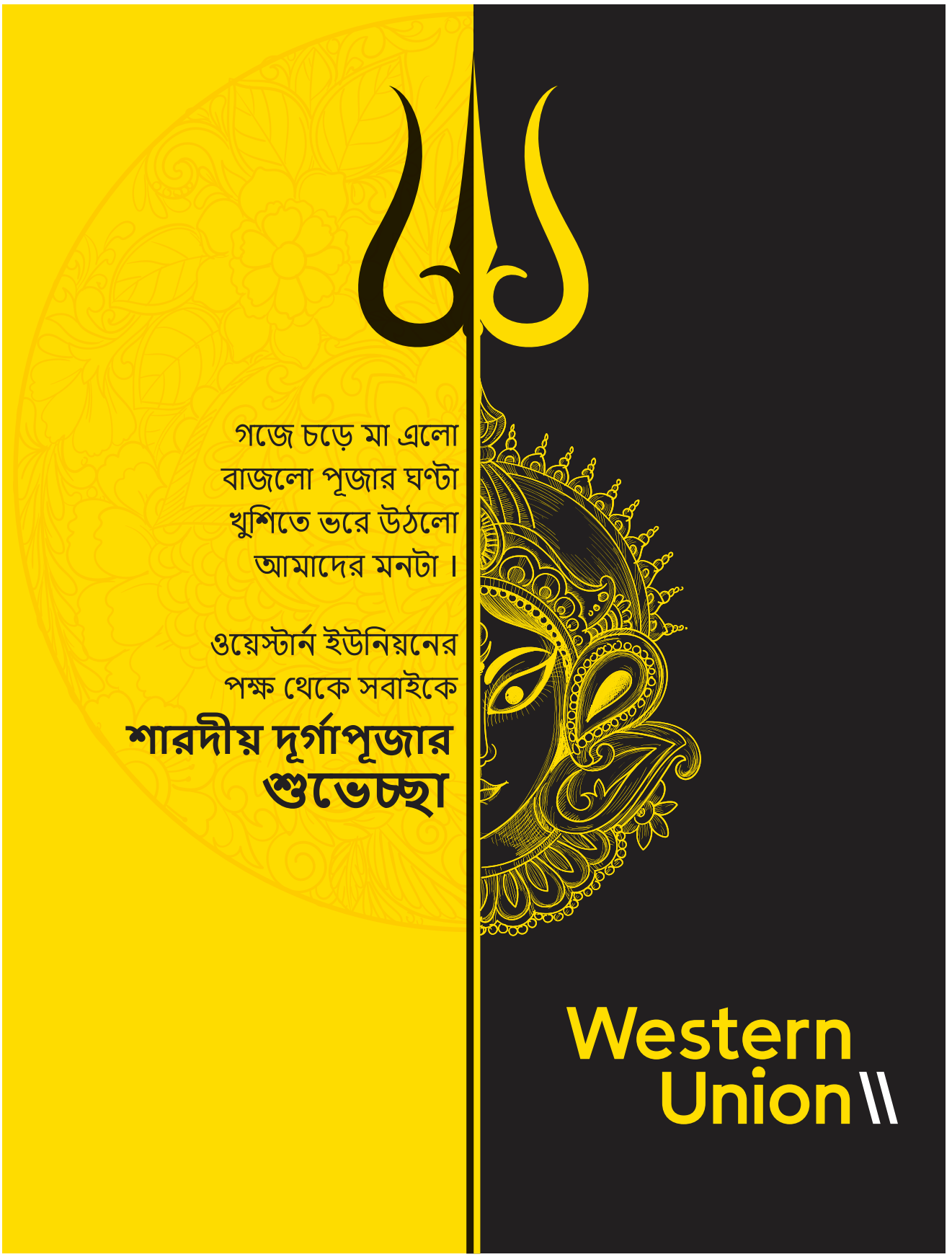
গজে চড়ে মা এলো
বাজলো পূজার ঘণ্টা
খুশিতে ভরে উঠলো
আমাদের মনটা।
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের
পক্ষ থেকে সবাইকে
শারদীয় দূর্গাপূজার
শুভেচ্ছা
Western
Union

একজন রত্নগর্ভা মায়ের কথা

m½xZ Kzgvi †Nvl

স্মরণ করছি একজন সর্বংসহা মায়ের কথা, একজন রত্নগর্ভা মায়ের কথা। গত ২৫শে জুলাই তাঁর প্রয়াণ দিবস ছিল।

ভগবান এত সহ্যশক্তির পরীক্ষা আর কারো থেকে নিয়েছেন কি না জানা নেই।

শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসী। জগতবিখ্যাত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জননী।

১৮৪১ সালে অভিজাত পরিবারে জন্ম। ছেলেবেলায় মেমের কাছে ইংরাজি শিখেছিলেন। শিশু নরেন জননীর কাছেই প্রথম ইংরাজির পাঠ নেন। পরবর্তী কালে বিবেকানন্দর বিদেশি ভক্তদের সঙ্গে ইংরাজি তে কথাও বলেছেন। চরিত্রগুণে ছিলেন মহীয়সী। আর আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন সর্বংসহা।

আদরে ও ঐশ্বর্য্যে লালিত বাবা মার একমাত্র সন্তান ভুবনেশ্বরীর সারা জীবন শুধু দুঃখের কাহিনী। দশ বছর বয়সে বিয়ে। ছটি কন্যা ও চার পুত্রের জননী। অতি অল্প বয়সে বৈধব্য। অপরিসীম অভাব। পরনের শাড়িটি শতচ্ছিন্ন, এত গিঁট দেওয়া যে আর পরা যায় না। অন্তর্যামী ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বুঝতে পারলেন যে তাঁর প্রিয় নরেনের মায়ের পরনের বস্ত্রের দুর্দশার কথা। যখন নরেনকে তাঁর মার জন্য একটি বস্ত্র দিতে চাইলেন, নরেন তা নিতে অস্বীকার করেন। তারপর নিজে রামলালকে দিয়ে নরেনের মায়ের কাছে পৌঁছে দেন।

তারপর কখনো আদরের কন্যাদের আত্মহনন, প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া। শরিকি মামলায় বিপর্যস্ত হয়ে স্বামীর ভিটে থেকে বিতাড়ন এবং প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে পড়া।

তারপরে সম্ভবত তাঁর জীবনের সবথেকে অভিশপ্ত দিনটি এল ৫ই জুলাই ১৯০২।

বিবেকানন্দের দেহ যখন স্থাপন করা হল চন্দন কাঠের চিতায়, তখুনি সেখানে এসে পৌঁছলেন জননী ভুবনেশ্বরী।

চিৎকার করে কাঁদতে- কাঁদতে লুটিয়ে পড়লেন বেলুড় মঠের মাটিতে।

কী হল আমার নরেনের?

হঠাৎ চলে গেল কেন?
ফিরে আয় নরেন ফিরে আয়।
আমাকে ছেড়ে যাসনি বাবা।
আমি কী নিয়ে থাকব নরেন?
ফিরে আয়। ফিরে আয়।
সন্ন্যাসীরা তাঁকে কী যেন বোঝালেন।
তারপর তাঁকে তুলে দিলেন নৌকায়।
জ্বলে উঠল বিবেকানন্দের চিতা।
মাঝগঙ্গা থেকে তখনো ভেসে আসছে
ভুবনেশ্বরীর বুকফাটা কান্না।
ফিরে আয় নরেন ফিরে আয়।
ভুবনেশ্বরীর নৌকো ধীরে ধীরে
মিলিয়ে গেল।

তাঁর কান্না ফিরে আয় নরেন, ফিরে আয়, ভেসে থাকল গঙ্গার বুকে।

দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়। মধ্যম পুত্র মহেন্দ্রনাথ নিখোঁজ, কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ ইংরেজের বিরুদ্ধাচার করে জেলে এবং শেষ অব্দি মায়ের শেষ সম্বল গয়নাগুলো বেচে মার্কিন দেশে যাত্রা। এতকিছু নীরবে সহ্য করে নিঃসহায় অবস্থায় বিধবা মায়ের আশ্রয়ে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটান।

১৯১১ সালের ২৫শে জুলাই মেনিনজাইটিস রোগে মৃত্যু। শেষকৃত্যে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন মেজ ছেলে মহেন্দ্রনাথ ও সিস্টার নিবেদিতা। কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন। আর বিশ্বনন্দিত সন্ন্যাসী পুত্র বিবেকানন্দ তার ন'বছর আগেই মহাসমাধিতে মগ্ন।

রত্নগর্ভা বিবেকানন্দ জননীকে অন্তরের প্রণাম জানাই তাঁর প্রয়াণদিবসে।

সহ-সভাপতি
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

MAAS TRADERS LTD.

MAAS Traders

পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আসন্ন শারদীয় দুর্গা পুজার শুভেচ্ছা

HAPPY

DURGA PUJA

MAAS TRADERS LTD : Is an established fabrics suppliers in the garment and textile industry for both Woven & Knit fabrics since 2001

Contact: yamin@maastraders.com

কু-সন্তান

সান্তনু দাস

দিনশেষে আমরা সবাই স্বার্থপর। সত্যিই স্বার্থপর। এক ছেলে বড় অফিসার হয়ে মাকে গ্রামে রেখে শহরে মোজাইক করা দামি বাসা নিয়ে স্ট্যাটাস ম্যাইনটেইন করছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, মা কোথায়? উত্তর দিলেন- "মাকে সপ্তাহখানেক বাসায় রেখেছিলাম। কিন্তু শহরে এতো ছোট বাসায় মাকে বেশিদিন কিভাবে রাখবো!" পাল্টা প্রশ্নে জানতে চাইলাম- "যে মা আপনাকে দশমাস তার ছোট্ট গর্ভে রাখতে পেরেছিলেন, সে মাকে ১০ দিন নিজের এত বড় বাসায় রাখার সামর্থ্যও আপনার নেই?" ভদ্রলোক বিব্রত ও বিরক্ত হলেন। আসার সময় বলে এলাম- "গ্রামের বাড়িটা একটু মজবুত করে রাখেন। তবে আপনার মার জন্য না, আপনার জন্য। কারণ ২০ বছর পর হয়তো আপনার ছেলের বাসায়ও আপনার জায়গা হবে না, তখন আপনাকেও সেখানে গিয়ে থাকতে হতে পারে।" কতটা অকৃতজ্ঞ এরা।

বন্ধুদের সাথে যখন দামি রেস্টুরেন্টে বসে জন্মদিনের পার্টিতে মেতে উঠেন, তখন কি একবারও সেই নারীটির কথা মনে পড়ে যিনি আপনাকে জন্ম দিয়েছিলেন? ছোটবেলায় খেলতে গিয়ে কখনো একটা হাড় ভেঙেছিল আপনার? জানেন একটা হাড় ভাঙলে কতটা কষ্ট লাগে? আমি জানি, আমি দেখেছি আমার বন্ধুটির হাড় একটা ভেঙে যাওয়াতে কী পরিমাণ কান্না করে সে আর্তনাদ করেছিল। ভাই, আপনার মা, আমার মা এই আমাদের মা আমাদের জন্ম দিতে গিয়ে যে পরিমাণ প্রসব বেদনায় ছটফট করেছিলো, সেটা ২০ টা হাড় ভাঙার মতই তীব্র যন্ত্রণাদায়ক।

ছোটবেলায় আপনি যখন ভয় পেয়ে কান্না করতেন, তখন আপনার কান্নার শব্দ শুনে সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কে এগিয়ে আসত? মা। যখন শিশুকালে আপনি কথা বলতে জানতেন না, তখন আপনার চেহারা দেখে কে জ্যোতিষীর মত বলে দিতে পারত আপনি ক্ষুধার্থ? আপনার মা। ঈদ কিংবা পুজোয় কে নিজের পোশাকের আগে আপনার নতুন পোশাকের কথা ভাবত? আরে ভাই আপনার মা। যেদিন আপনি স্কুলে প্রথম পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলেন তখন কে তা সবাইকে বলে বেড়িয়েছিল? আপনার মা। ক্লাস ওয়ানের ছেলের পরীক্ষার পাশ নিয়ে মা এমনভাবে সবাইকে বলে বেড়িয়েছিল, হয়তো পাশের বাড়ির অনেক ঘষেটি বেগম মুচকি হেসে কানাঘুষা করেছিল, "ক্লাস ওয়ানের পাশ নিয়ে এমন লাফালাফি করছে, যেন ছেলে ব্যারিস্টারি পাশ করেছে।" আপনার ক্লাস ওয়ানের পাশটা অন্যদের কাছে মামুলি ব্যাপার ছিল; কিন্তু আপনার মায়ের কাছে সেটা জীবনের বড় অর্জন ছিল। সে মাকে যে কষ্ট দিতে পারে, সে পৃথিবীর কয়েকশ মানুষকে একদিনে খুন করতে পারে অনায়াসে।

ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে আপনি দুই হাত চেপে ধরেন দুর্গন্ধে। অথচ একজন মা এর চেয়ে দ্বিগুণ টয়লেটের গন্ধ ২/৩ বছর টানা সহ্য করেছে একজন সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে। কী বিশ্রী কথা বলছি আমি, তাই না? আরে ভাই, এই বিশ্রী কাজটা আপনি আমি আমাদের মায়ের কোলে বসে করেছি। হয়তো তিনি আপনাকে কোলে নিয়ে দুপুরে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত শরীরে খেতে বসেছে, আর আপনি কোলে বসেই টয়লেট করে দিলেন। তখন অন্যরা নাক চেপে বমি করছিলো দুর্গন্ধে। আর আপনার মা সেগুলো নিজ হতে পরিষ্কার করেছিল। সে মাকে ব্যাকডেটেড বলার আগে চিন্তার জগতে নিজে কতটুকু আপডেটেড ভেবে দেখুন।

আজ আপনি বিভিন্ন হেয়ার স্টাইলে ঘুরেন আর ম্যাচ করা ড্রেস পরেন। শৈশবে আপনার আমার মা-ই ছিল আমাদের ফ্যাশন ডিজাইনার। তিনিই সর্বোচ্চ সুন্দর করে আমাদের সাজিয়ে তুলতেন। প্রত্যেক মায়ের কাছে তার সন্তান যদি হীরের টুকরা হতে পারে, তবে সন্তানের কাছে মা'রা কেন এত অবহেলিত হয়? আজ যখন আপনি দূরে কোথাও যান, তখন সবাই অপেক্ষায় থাকে কার জন্য কী গিফট আনবেন সেটা নিয়ে। আর মা কয়েকবার ফোন করতে থাকে আপনি ঠিকমত পৌঁছেছেন কি-না সেটা জানতে। আপনি যখন ভালো কিছু করেন তখন তাতে আপনার জীবনটা উজ্জ্বল হয়। আপনি যখন ভালো একটা চাকরি পান তখন মাস শেষে বেতন আর আজীবন সম্মান তো আপনিই পান; অথচ তাতে আপনার চেয়ে আপনার মা-ই বেশি খুশি হোন। কারণ তাঁর হীরের টুকরোটা আকাশ ছুঁয়েছে বলে। ভাই, এটা মায়ের পক্ষেই সম্ভব। তবু দিনশেষে মায়ের সন্তানেরা অফিসার হয় কিন্তু অনেক অফিসারের কেন যেন কোনো মা থাকে না। আমাকে যদি বলা হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ত্যাগী মহিলা কে? আমি একশব্দে এক সেকেন্ডে বলে দিব- মা।

বাবারা কেমন হয় জানেন? ছেঁড়া শার্ট পরে যে লোকটা সন্তানের জন্য সবচেয়ে ভালো শার্টটা নিয়ে আসে

ওনাকে আমরা বাবা বলি। দুপুরে রিক্সাভাড়া সেভ করতে গিয়ে লোকটা নিজে হেঁটে গিয়ে সন্তানের কলেজে যাওয়ার গাড়ি ভাড়া জমায়, তিনি বাবা। হ্যাঁ, বাবারা এমনই হয়।

আপনার সফলতার জন্য সবচেয়ে বেশি যাদের আশীর্বাদ দরকার তারা হলেন বাবা-মা। সেখানে সফলতার জন্য কোনো লজিক কাজ করে না, যেখানে স্ট্র্যাটেজি ব্যর্থ হয় সেখানে একমাত্র আশীর্বাদ সবচেয়ে বেশি কাজ করে।

পৃথিবীর কোনো জায়গায় আপনি সফল হতে পারবেন না, সফল হতে পারলেও সুখী হতে পারবেন না যদি বাবা মায়ের মনে দুঃখ দেন। যে মায়ের গর্ভে সন্তানের প্রথম নিরাপদ আশ্রয় হয়, সে মায়ের শেষ ঠিকানা কী করে বৃদ্ধাশ্রম হয়? বৃদ্ধাশ্রমে থাকা প্রতিটা মা বাবার দীর্ঘশ্বাসে শুধু একটা বিষয়ই ফুটে উঠে। তা হলো কতটা জীবিত কু-সন্তান আমাদের পৃথিবীতে আছে।

"দ্যা হিডেন পাওয়ার" থেকে সংগৃহীত

সহ-সভাপতি
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
সাধারণ সম্পাদক
দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লি:
কোষাধ্যক্ষ
শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দির, কলসকাঠী, বরিশাল
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ ফাউন্ডেশন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
অগ্রদূত ট্রেডার্স লিমিটেড

"পবিত্র বেদ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান"

মিলেনিয়াম রায় পূজা

আমরা মানব জাতি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। আদি কাল থেকে মানব সন্তানরা ক্রমাগত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রাণীকুলের শিরোমনি হিসাবে। মানুষের চেয়ে অনেক গুণ শারীরিক শক্তি সম্পন্ন প্রাণীরা পদপ্লুত..... হয়েছে মানুষের জ্ঞানের কাছে এমনকি প্রাচীন কালে পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপনকারী প্রাণী ডাইনোসরও হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। মানুষই এক মাত্র প্রাণী যাঁরা যেকোন পরিবেশে প্রতিকুলতায় নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। আর এভাবেই মানবকুল এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এর সবটুকু সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণে। বর্তমান যুগে সর্বত্র বিজ্ঞানের জয় জয়কার। আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন যাপনে বিজ্ঞানের অবদান বিস্ময় জাগানোর মতো।

বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ মুঠোয় পুড়ে নিয়েছে পৃথিবীকে। মহাশূন্য আধিপত্য বিস্তারে ও পরিচালিত করছে নানান অভিযান। বর্তমান সমস্যার সমাধানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এ লেখায় সনাতন ধর্মের রীতিনীতি ও শাস্ত্রবর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদি ও এটা একটা বৃহৎ ব্যাপার। সীমিত পরিসরে ব্যাখ্যা অসম্ভব। তারপর ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সন্ধ্যায় ধূপ-ধুনো (সালফার ডাই অক্সাইড) দিলে পোকা মাকড়, মশা, তেলাপোকা আশে পাশে থাকে না।

শঙ্খ ও উলুধ্বনি শেয়াল বিড়ালসহ বণ্য প্রাণীর উৎপাত কমায়। এ গুলো মোটেই কুসংস্কার নয়। ক্যান্সার ও হাঁপানী থেকে বাঁচবার একমাত্র নিরাপদ উপায়। সারা বিশ্বে আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের এতো জয়জয়কার এর সবটুকু সুতিকাগারই ছিলো ভারতের ঋষিদের দখলে। মিশর ও আরবের লোকেরা চিকিৎসার জন্য ভারতে আসতেন। চোখের ছানি অপারেশনের পিতা ডাঃ শত্রুত, তিনি অঙ্গ প্রতঙ্গ জোড়া লাগাতে পারতেন। পরবর্তিতে অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয় এই বিদ্যা আয়ত্ব করেন। এই বিদ্যা প্রয়োগ প্রায় দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় জন্মানো জরাসন্ধকে জোড়া লাগিয়ে বাঁচিয়ে ছিলেন এরাই। ইনিই সেই পরাক্রমশালী মগ্ধরাজ জরাসন্ধ, যার কাছে রাজ্য হারাবার ভয়ে তটস্থ ছিলেন মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম। সুতরাং দেখা যায় সুপ্রাচীন কালেও ছানি অপারেশনের ও হাড় জোড়া লাগানো বিদ্যা মানুষের আয়ত্বে ছিলো। বিশাল্যকারনির রসে লক্ষণ বেঁচে উঠলেন সেটাতো রামায়ণেই বর্ণিত আছে। জড়ি বুটি রস এবং ঋগবেদের আয়ুর্বেদ পুরোটাই চিকিৎসা সংক্রান্ত। (ভারত বিভক্ত না হলে আজ ইংরেজিতে নয়, সংস্কৃতে বিজ্ঞানের মেডিকেল সায়েন্স পড়তে হতো) তারপর ও আরবরা এদেশ থেকে যা নিয়ে ছিলো তা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধশালী করছে। (ডাঃ সি এন সি বোস সনাতন ধর্ম ও বিজ্ঞান) তৎকালীন ঋষিরা মানবদেহের কোথায় কী আছে তা ভালো করেই জানতেন। এমনকি তৎকালীন সময়ে মানবদেহের অভ্যন্তরের অনেক ছবি এঁকেছিলেন ঋষিরা। যা দেখলে বিস্মিত নাহয়ে উপায় নেই এখন আসা যাক শাস্ত্রবাণীর সাথে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিভিন্ন ধারনা মিলের প্রসঙ্গে।

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বইটির মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং পরিণতি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন যে সেকেলের নয় বরং কয়েল ও মরটিন থেকে সৃষ্ট শুন্য সুতরাং উত্তাপ ছিলো অসীম। মহাবিশ্ব

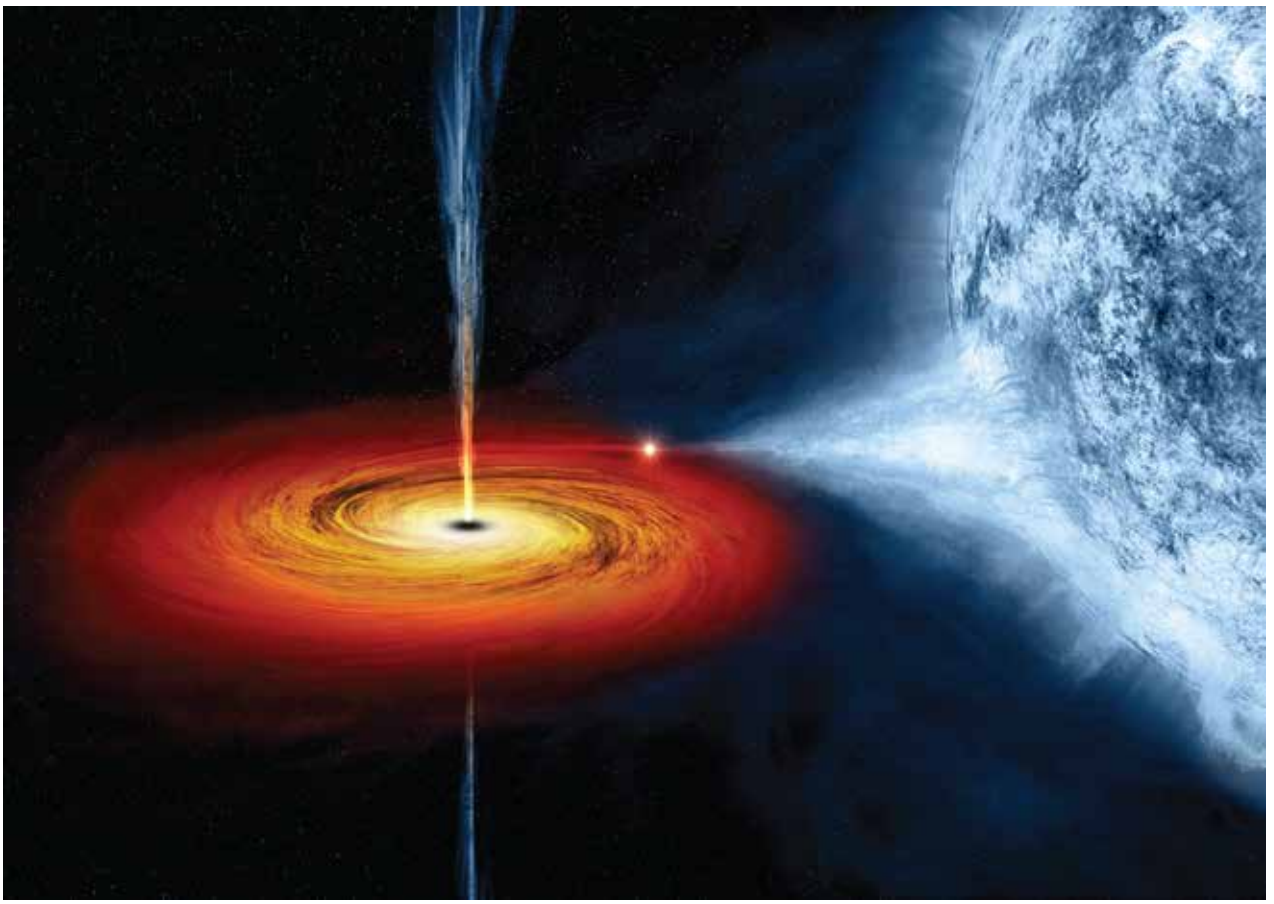

সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা নেমে এসেছিলো প্রায় এক হাজার কোটি ডিগ্রিতে। এ তাপ সূর্যের কেন্দ্রের তাপের চেয়ে প্রায় এক হাজার গুণ বেশি। ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে "পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি, প্রকৃতির সাম্য, অব্যক্ত অবস্থা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্টির শুরু হয়"। অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ অবস্থা থেকে সৃষ্টির শুরু। আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় একই কথা বলে। বিজ্ঞানীরা বলেন একটি বড় ধরনের বিস্ফোরক থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। যাকে বিগব্যাঙ বলা হয়।

পর্ব-২

ঋগবেদে বলা হয়েছে, যজ্ঞের সনদ হতে স্রোত প্রকৃষ্ট রূপে গমন করুক। সূর্য কিরণসমূহ দ্বারা বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্যের তাপে সমুদ্র ও জলাশয়ের জল বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠে ঘণীভূত ও শীতলীভূত হয়ে মেঘে, সর্বশেষ বৃষ্টি রূপে মাটিতে নেমে আসে। সংক্ষেপে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পানি চক্র। পানি চক্রের এই প্রক্রিয়া ঋগবেদের উপরোক্ত শ্লোকের সাথে অনেকাংশে মিলে যায়।

বিজ্ঞানীরা ভিনগ্রহের প্রাণের অস্তিত্বের অনেক প্রমাণ পেয়েছেন। পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহে প্রাণী রয়েছে এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। ভাগবতে বলা হয়েছে– "নভো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মাদদঃ লোকং স্বদেহং তনুতে মহান সপ্তভিরা বৃতমঃ (ভাঃ)। ৩/২৯/৪৩-অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণে আকাশ অন্তরীক্ষে বিভিন্ন গ্রহদের স্থান প্রদান করে। যেখানে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। তাঁর পরম নিয়ন্ত্রণে সমস্থ ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীর সুপ্ত আবরণসহ বিস্তৃত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আবরণে ধারণ হয়। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে- "যঃ করণার্ণবজলে ভজতি যোগনিদ্রমনন্ত জগদ গুসরোমকুপঃ, আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাংস্বমূর্তিং গোবিন্দ আদি পুরুষংতহমং ভজামি"।

ব্রহ্মা বলছেন, "আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাহার অংশবতার মহাবিষ্ণুরূপে কারন সমুদ্রে যোগনিদ্রায় শায়িত এবং তাহার দিব্য শরীরের রোমকুপ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বুদবুদ আকারে প্রকাশিত হইতেছে"। বর্ণনা মতে মহাবিষ্ণু কারন সমুদ্রে (Causal Ocean) যোগনিদ্রায় শায়িত আছেন। ঐ বুদবুদ গুলি পরবর্তিতে এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে বিবর্তন বা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ সমুদ্র (Causal Ocean) হলো এক একটি ব্লাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর।

রাধামাধবের লীলাভূমি বৃন্দাবন

দীপ্তি সাহা

বৃন্দাবন হল ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মথুরা জেলার অন্তর্গত একটি শহর। ঈশ্বর পরম রাধামাধব এখানে নিজেদের সচ্চিদানন্দ ছেলেবেলার লীলা প্রকাশ করে থাকেন। শহরটি ঈশ্বর পরম রাধামাধবের ভূলোকের লীলাভূমি জেলাসদর মথুরা থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে আগ্রা-দিল্লি হাইওয়ের উপর অবস্থিত। বৃন্দাবন শহরে রাধা ও কৃষ্ণের অনেকগুলি মন্দির আছে। হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে এটি একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

নাম-ব্যুৎপত্তি

সংস্কৃত ভাষায় 'বৃন্দাবন' কথাটি এসেছে 'বৃন্দা' (তুলসী) ও 'বন' (অরণ্য) শব্দ দুটি থেকে। নিধুবন ও সেবাকুঞ্জে দুটি ছোটো তুলসীবন এখনও বিদ্যমান।

ইতিহাস

বৃন্দাবন একটি প্রাচীন শহর। এই শহর হিন্দু ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত এবং হিন্দুধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। এই শহরের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির একটি হল গোবিন্দদেব মন্দির। এটি ১৫৯০ সালে নির্মিত হয়। সেই শতাব্দীরই গোড়ার দিকে বৃন্দাবন একটি শহর হিসেবে গড়ে ওঠে। বৃন্দাবনের আদি অবস্থান কোথায় ছিল, তা ১৬শ শতাব্দীর আগে মানুষ ভুলে গিয়েছিল। চৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থান পুনরাবিষ্কার করেন। ১৫১৫ সালে কৃষ্ণের বাল্যলীলার স্থানগুলি নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে এসেছিলেন। কথিত আছে, তিনি দিব্য প্রেমের আধ্যাত্মিক ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে বিভিন্ন পবিত্র বনে পরিভ্রমণ করেছিলেন। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, তিনি তাঁর দৈব আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে বৃন্দাবন ও তার চারপাশে যে সকল স্থানে কৃষ্ণ তাঁর বাল্যলীলা করেছিলেন বলে মনে করা হয়, সেগুলি আবিষ্কার করেন।

মীরা বাই মেবার রাজ্য পরিত্যাগ করে তীর্থযাত্রা করতে করতে বৃন্দাবনে আসেন। তিনি জীবনের শেষ ১৪ বছর বৃন্দাবনেই কাটান। যে মন্দিরে তিনি ছিলেন সেটি এখন 'প্রাচীন মীরাবাই' নামে পরিচিত।

বিগত ২৫০ বছরে বৃন্দাবনের অধিকাংশ বনই নগরায়ণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই নগরায়ণ প্রথম শুরু করেন স্থানীয় রাজারা। পরবর্তীকালে সেই কাজ চালিয়ে নিয়ে যান গৃহনির্মাতা সংস্থাগুলি। শুধুমাত্র কয়েকটি স্থান ছাড়া বাকি অঞ্চলের বনাঞ্চল স্থানীয় ময়ূর, গরু, বাঁদর ও বিভিন্ন ধরণের পাখিসহ বিলুপ্ত হয়। শহরে এখন অল্প ময়ূরই দেখা যায়। তবে বাঁদর ও গরু শহরের সর্বত্রই দেখা যায়।

জনপরিসংখ্যা

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, বৃন্দাবনের জনসংখ্যা ৫৬,৬১৮। জনসংখ্যা ৫৬% পুরুষ ও ৪৪% নারী। বৃন্দাবনের সাক্ষরতার গড় হার ৬৫%, যা জাতীয় গড় হার ৭৪.০৪%-এর কম। বৃন্দাবনে জনসংখ্যার ১৩%-এর বয়স ৬ বছরের নিচে।

ধর্মীয় ঐতিহ্য

হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে বৃন্দাবন একটি পবিত্র তীর্থস্থান। দেবী রাধা হলেন বৃন্দাবনের অধীশ্বরী। তাই তিনি বৃন্দাবনেশ্বরী। এটি বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা ও বৃন্দাবনেশ্বর কৃষ্ণের উপাসনার পীঠস্থান। বৃন্দাবন, গোবর্ধন ও গোকুল কৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে যুক্ত। কৃষ্ণের ভক্তেরা প্রতি বছর এই স্থানে তীর্থযাত্রায় আসেন এবং বিভিন্ন উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। ভাগবত পুরাণ অনুসারে, কৃষ্ণ গোপীদের গ্রাম গোকুলে তাঁর পালক পিতামাতা নন্দ ও যশোদার গৃহে পালিত হয়েছিলেন। উক্ত পুরাণ অনুসারে, রাধিকা ও কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনেই রাসলীলা ও অন্যান্য বাল্য লীলা করেন। তাঁর দাদা বলরাম ও অন্যান্য রাখাল বালকদের সঙ্গে তিনি এখানে দুষ্টুমি করে বেড়াতেন।

মন্দিরসমূহ

- মদনমোহন মন্দির- মুলতানের রাজা কাপুর রাম দাস কালীয়দমন ঘাটের কাছে মদনমোহন মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এটি বৃন্দাবনের অন্যতম প্রাচীন মন্দির। চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের সঙ্গে এই মন্দিরটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই মন্দিরের আদি মদনগোপাল বিগ্রহটি নিরাপত্তাজনিত কারণে রাজস্থানের কারাউলিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে এই মন্দিরে মূল বিগ্রহের একটি প্রতিমূর্তি পূজিত হয়।

- মীরা বাই মন্দির- নিধিবনের কাছে শাহজি মন্দিরের দক্ষিণ দিকে মীরা বাই মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটি মীরা বাইয়ের মন্দির। কোনো কোনো জীবনীগ্রন্থে বলা হয়েছে, ১৫৪৭ সালে দ্বারকায় মীরা বাই সশরীরে দ্বারকায় কৃষ্ণ বিগ্রহে বিলীন হয়ে যান। তবে গবেষকরা এই কিংবদন্তির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন না। তবে একথা সত্য যে, মীরা বাই কৃষ্ণ-উপাসনা নিয়েই থাকতেন এবং তাঁর রচিত ভজনগুলি তাঁকে ভক্তি আন্দোলন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্ত-কবির স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল।

- বাঁকেবিহারী মন্দির- স্বামী হরিদাস নিধিবন থেকে বাঁকেবিহারীর

(রাধাকৃষ্ণের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি) বিগ্রহটি আবিষ্কার করার পর ১৮৬২ সালে বাঁকেবিহারী মন্দির নির্মিত হয়।

• প্রেম মন্দির- বৃন্দাবনের উপকণ্ঠে ৫৪ একর জমির উপর প্রেম মন্দিরটি নির্মিত। এটি প্রতিষ্ঠা করেন কৃপালু মহারাজ। মূল মন্দিরটি শ্বেতপাথরে নির্মিত এবং সেখানে কৃষ্ণের বহু মূর্তি খোদিত রয়েছে।

• রাধাবল্লভ মন্দির- হরিবংশ মহাপ্রভু রাধাবল্লভ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের বেদীতে কৃষ্ণের বিগ্রহের পাশে দেবী রাধার একটি মুকুট রাখা থাকে।

• জয়পুর মন্দির- জয়পুরের মহারাজ দ্বিতীয় সাওয়াই মাধো সিং ১৯১৭ সালে রাধামাধব মন্দির বা জয়পুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

• রাধারমণ মন্দির- গোপাল ভট্ট গোস্বামীর অনুরোধে রাধারমণ মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরে কৃষ্ণের একটি শালগ্রাম বিগ্রহ রয়েছে।

• শাহজি মন্দির- ১৮৭৬ সালে লখনউয়ের শাহ কুন্দন লাল এই মন্দিরের নকশা করেন এবং মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরটি অনন্য স্থাপত্যশৈলী ও শ্বেতপাথরের সুন্দর ভাস্করর জন্য বিখ্যাত। মন্দিরে বারোটি সর্পিল স্তম্ভ রয়েছে। প্রত্যেকটি স্তম্ভের উচ্চতা ১৫ ফুট। এছাড়া মন্দিরে বেলজিয়াম কাঁচের ঝাড়বাতি ও তৈলচিত্র সমন্বিত একটি হলঘরও আছে।

• রঙ্গজি মন্দির- ১৮৫১ সালে নির্মিত রঙ্গজি মন্দির বিষ্ণুর অন্যতম রূপ রঙ্গনাথ বা রঙ্গজির প্রতি উৎসর্গিত। এই মন্দিরে বিষ্ণু অনন্তশায়ী ভঙ্গিমায় পূজিত হন। মন্দিরটি দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। এতে একটি ছয় তলা গোপুরম ও ৫০ ফুট উঁচু ধ্বজা স্তম্ভ রয়েছে। প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে মন্দিরে ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরের উদ্যানে রথযাত্রা আয়োজিত হয়।

• গোবিন্দদেব মন্দির- ১৫৯০ সালে মুঘল সম্রাট আকবরের দান করা লাল বেলেপাথর দিয়ে রাজা মানসিংহ সাত তলা উঁচু গোবিন্দদেব মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব এই মন্দিরটি ধ্বংস করে দেন।

• রাধা দামোদর মন্দির- ১৫৪২ সালে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী কর্তৃক সেবাকুঞ্জে রাধা দামোদর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

• বৃন্দাবন শক্তিপীঠ/কাত্যায়নী মন্দির ও ভূতেশ্বর মহাদেব মন্দির- রঙ্গনাথ মন্দিরের কাছে রাধাবাগে কাত্যায়নী মন্দির অবস্থিত। এটি একটি শক্তিপীঠ। কথিত আছে, এখানে দেবী সতীর আঙটি পড়েছিল।

• চিন্তাহরণ হনুমান মন্দির- অটলবনের কাছে অবস্থিত চিন্তাহরণ হনুমান মন্দিরটি হল হনুমানের মন্দির।

অন্যান্য পবিত্র স্থান

বৃন্দাবনের অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলি হল সর্বেশ্বরী রাধারানী মন্দির, সেবাকুঞ্জ, কেশীঘাট, শ্রীজি মন্দির, যুগলকিশোর মন্দির, লালবাবু মন্দির, রাজঘাট, কুসুম সরোবর, ইমলিতল, কালীয়ঘাট, রমণরেতি, বরাহঘাট, চিরঘাট, স্বামী হরিদাসের সমাধি। স্বামী হরিদাসের সম্মানে তাঁর সমাধিতে প্রতি বছর একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে ভারতের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞেরা গান পরিবেশন করেন। সেবাকুঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণ করে ব্রজ ফাউন্ডেশন।

"বিধবার নগরী"

বৃন্দাবন "বিধবার নগরী" নামেও পরিচিত। কারণ, স্বামীর মৃত্যুর পর বহুসংখ্যক বিধবা বৃন্দাবন ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। এই অঞ্চলে প্রায় ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ বিধবা বাস করেন। এঁরা ভজনাশ্রমগুলিতে ভজন গেয়ে সময় কাটান। অবহেলিত নারী ও শিশুদের সাহায্যার্থে বৃন্দাবনে গিল্ড অফ সার্ভিস নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। একটি সরকারি সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুসারে, এই শহরে সরকার ও বিভিন্ন এনজিও বিধবাদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা করে।

উপাসনা ও সঙ্গীত

হিমানী রানী আদিত্য

অন্তরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ উচ্ছ্বাস, ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আত্মপ্রকাশের ভাষা হলো এই সঙ্গীত। এই আত্মপ্রকাশের মাধ্যমেই মানুষ বারংবার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয় এবং প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক আনন্দ বেদনার মধ্যে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে। সঙ্গীত সহজেই এই সান্নিধ্য এনে দেয়।

সঙ্গীত আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে Red Auerbach বলেছেন: "Music washes away from the soul the dust of everyday life" অর্থাৎ সঙ্গীত দ্বারাই এই আত্মশুদ্ধি সম্ভব।

সঙ্গীতমনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে এবং মনের দৃঢ়তা শক্তি বৃদ্ধি করে মন ও শরীরকে অনেকাংশে সুস্থ করে তুলতে পারে। সঙ্গীত এর যথার্থতা উপলব্ধি করা যায় যখন শারীরিক ও মানসিক আরোগ্যের জন্য Music therapy প্রয়োগ করা হয়।

সঙ্গীতের আদি সূচনা বৃক্ষের পাতার শব্দ থেকে এবং অনেকের ধারনা সঙ্গীতই সাক্ষাত ঈশ্বর। সমুদ্রের কলতান, পাখির কলরব, নৌকার দাঁড়ের ধ্বনি ইত্যাদিও অন্তরনিহিত যে সঙ্গীত তা স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর আছেন নিবিড় অন্তরে। সেই নিবিড় অন্তরে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে সঙ্গীতের প্রয়োজন। নিবিড় অন্তরেই আমরা ঈশ্বরকে শ্রবণ করি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন:

"শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত্ত গভীরে"-

বিশ্বের সর্বত্রই সঙ্গীত বিরাজমান, কারণ এই বিশ্বই সঙ্গীত দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। তাই সঙ্গীতের মাধ্যমে বহির্জগতের অন্তরে অনুসরণ দ্বারা আমরা ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ করি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়-

"হংস বলাকা উড়ে যায়
দূরের তীরে, তারার আলোয়,
তারি ডানার ধ্বনি বাজে মোর
অন্তরে।"

প্রেম পর্যায়ের এই গানে বহির্জগতের ধ্বনির অন্তরে অনুরণন দ্বারা গভীর অনুভূতি ও ঈশ্বরের জন্য আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মানবপ্রেম হলো ঈশ্বরপ্রেমেরই প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি।

ধ্বনি যখন সঙ্গতি ও সমন্বয় হারিয়ে ফেলে তা হয়ে ওঠে কোলাহল; তখন তা আর সঙ্গীত থাকে না। তাই প্রাত্যহিক জীবনে সঙ্গতি ও ছন্দ ফেরাতে এবং কোলাহল থেকে অব্যাহতি পেতে সঙ্গীতই ঈশ্বর সাধনার পরম পন্থা। এই জন্য সঙ্গীতের মাধ্যমে উপাসনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন :

"আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে"।

অন্তরের গভীর আকুতি প্রকাশ পায় সঙ্গীতে। এই আকুতি জ্ঞাপন করার কোন ভাষা নেই, আছে শুধু সঙ্গীত। "Music is the medicine of the breaking heart" অর্থাৎ সঙ্গীত হচ্ছে ভঙ্গুর মনের ঔষধ- বলেছেন এ.হান্ট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তিবাদ সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। পূজা পর্যায়ের ৬২৬টি গানে এবং প্রেম প্রকৃতি ইত্যাদি পর্যায়ের গানে কবি বারংবার ঈশ্বরের দ্বারস্থ হয়েছেন।

কবিগুরু ধর্মকে সঙ্গীতশালা মনে করতেন। তাঁর ভাষায়- "ধর্ম সেই সঙ্গীতশালা যেখানে পিতা তার পুত্রকে গান শিখাচ্ছেন অর্থাৎ পরমাত্মা হতে আত্মায় সুর সঞ্চারিত হচ্ছে।" এই সুন্দর ভুবনই ঈশ্বরের প্রকাশ এবং পরম সুন্দর সঙ্গীত। তাই কবিগুরু ঈশ্বরলব্ধ সঙ্গীতকে সঙ্গীত দিয়েই পূজা করেছেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের জীবনকে সুরের বাঁধনে বেঁধেছেন-

"আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি প্রাণ
সুরের বাঁধনে।"

সব সময় সব অবস্থাতেই মানুষ ঈশ্বরকে ভাবে। আনন্দে যেমন ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, দুঃখে ও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। হয়তো বা দুঃখে আরও নিবিড় ভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়। তাই কবিগুরু বলেছেন-

"সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।"

তাই দুঃখের সময় উপাসনা সঙ্গীত পরিবেশন করে মানুষ সান্ত্বনা খোঁজে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "ঈশ্বরকে স্মৃতি পথে রাখবার সর্বোত্তম সহায়ক সঙ্গীত। কারণ সঙ্গীত মানুষের মনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে যা মূহুর্তে মনকে একাগ্র করে দেয়। ফলে অতিশয় তামসিক জড় প্রকৃতির ব্যাক্তিগণ উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করে একাগ্র হয়ে যায়। এমনকি কুকুর, বিড়াল, সর্প, সিংহ প্রভৃতি জন্তুরাও সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হয়ে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দ আরও বলেছেন যে, সঙ্গীত যিনি বুঝেন তাঁর কাছে সঙ্গীতই হলো উপাসনার মাধ্যম। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ তার দৈনন্দিন ঘাত প্রতিঘাত থেকে মুক্তি পেতে সঙ্গীত সহযোগে পূজা অর্চনা করে আসছে। কখনও সে সঙ্গীতে থাকে বাণী, কখনও বাণীর উর্ধ্বে অন্তরের অনুভূতিকে ব্যক্ত করে। সঙ্গীত অন্তরাত্মাকে সুপ্তি থেকে জাগ্রত করে। এই অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করার পথই

হলো উপাসনা যার মাধ্যমে ঈশ্বরের দ্বারস্থ হয়।

"Music is the mediator between the spiritual and the sensual life" বলেছেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ Tudwig Von Beethoven.

বৈদিক যুগেও ঈশ্বরের প্রার্থনায় নানাবিধ মন্ত্র সুর সমেত পাঠ করা হতো। সাম বেদে প্রধানত অগ্নি, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তব স্তুতি পাওয়া যায়। এই স্তব স্তুতি সুর সমেত পাঠ করা হতো বলে সাম গান বলা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, ভক্তিই হলো মোক্ষ লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। ভক্তি সাধনার নানা রকম দিক আছে। এই দিকের মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, আত্মনিবেদন সঙ্গীত দ্বারা সিদ্ধ হতে সক্ষম। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় উপাসনার সময় সঙ্গীত পরিবেশনের রীতি আছে।

মানবসভ্যতায় সঙ্গীতের সঙ্গে উপাসনার সম্পর্ক চিরকালই। আদিবাসীদের পরবে সঙ্গীত গীত হয়। লোক সঙ্গীতে ও ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়। বাউল কীর্তন সঙ্গীত আমাদের বাংলায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং প্রভাব ফেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানেও। সুফি সম্প্রদায়ও সঙ্গীতকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পন্থা হিসেবে মনে করেন।

ভারতবর্ষে সাধারণভাবে "সংকীর্তন" কথাটি ঈশ্বরের বন্দনাই বোঝায়। বাংলাতেও প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগে গান হলো ঈশ্বর আরাধনার এক অপরিহার্য অংশ। চর্যাপদ, মঙ্গলগীতি, পদাবলী, রামপ্রসাদী, শ্যামাসঙ্গীত, দুর্গাবন্দনা, আগমনী, পাঁচালী ইত্যাদি গীত হয় নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে।

শাস্ত্রে বলা হয় যে, মানুষ আনন্দমুখী এবং ঈশ্বর নির্মিত। এই বিশ্বের সর্বত্রই মানুষ আনন্দের সন্ধান করে। সঙ্গীত দেয় অপার অসীম আনন্দ। তাই আনন্দ পূজারী মানুষ সঙ্গীত পরিবেশনের সঙ্গে অন্তরের অন্তস্থলে আনন্দে ঈশ্বরকে স্থান দেয়। সর্বকাজেই উপাসনার প্রয়োজন, আর এই উপাসনায় সঙ্গীত অধিকার করে আছে এক বিশিষ্ট স্থান।

সিনিয়র শিক্ষক (অবঃ)
গভঃ মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

পুজোয় সংসারের কর্তা মহাদেবের ভাবনা

অসীম কুমার দাশ

হিমালয় পর্বতে শরতের আলো ঝলমলে এক নির্জন দুপুরে উদাস মনে মহাদেব বসেছেন সিদ্ধি হাতে, নানা রকম এলোমেলো চিন্তায় মনটা ভরে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা কেউই বাড়ি নেই। অস্বাভাবিক নীরব হয়ে আছে চারিদিক। সামনের বট গাছে একটা নাম না জানা পাখি অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছে তার সাথিকে। নেশাটা বেশ ভালোই জমেছে। পার্বতী দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে করতে গান গাইছে। ভেতর থেকে তারই মিষ্টি সুর ভেসে আসছে। শরতকালে পার্বতীকে যেন চেনাই যায় না। বাপের বাড়ি যাবার আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে,কথায় কথায় গান,কথায় কথায় হাসি। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী ও যেন ঝলমল করে ওঠে। কিন্তু আসন্ন বিরহের আশায় মহাদেবের মনটা ছটফট করতে থাকে। খুট করে দরজা খোলার আওয়াজে চিন্তায় বাধা পড়লো। সুন্দর একটা শাড়ি পরে সেজেগুজে ঘরে ঢুকল পার্বতী, - 'কি গো, চুপ করে বসে কি অতো ভাবছ? আমাকে এক্ষুনি একটু শপিং এ যেতে হবে। ছেলেমেয়েরা এলে বলো টেবিলে খাবার ঢাকা দেয়া আছে, গরম করে যেন খেয়ে নেয়। আমার ফিরতে দেরি হবে হয়তো।' এই বলে পার্বতী বেরিয়ে গেল।

মহাদেব আবার ভাবতে বসলেন। এই এক ঝামেলা, বাপের বাড়ি যাবে, বাজারের যেন শেষ নেই। পারলে বোধহয় পুরো হিমালয় পাহাড়টাই নিয়ে যায়। এদিকে যা দিনকাল পড়েছে, একটু বুঝেশুনে না চললে কি হয়? অথচ কিছু বলতে গেলেই মুখ ভার। সব কিছু সহ্য হয় শুধু পার্বতীর মুখে হাসি না দেখলে যেন ভালো লাগেনা। পার্বতী ও সেটা ভালোভাবেই জানে আর সে সুযোগ নেয়। আগে মাত্র তিন দিন এর ব্যাপার ছিল, কষ্ট হলেও দেখতে দেখতে সময় কেটে যেত। কিন্তু এখন আবার ঢং হয়েছে, শুধু বাপের বাড়ি গিয়ে শান্তি নেই, পুজোর নামে বিলেত, আমেরিকাও যাওয়া চাই। কিছু বলতে গেলে অমনি মুখ ঝামটা- 'ওরা অত করে ডাকে, না গিয়ে কি পারি? হাজার হোক ওরাও তো আমার নিজের লোক। বেচারারা এমনিতেই বিদেশে পড়ে আছে, দেশের পুজোর আনন্দে তো তারা যোগ দিতে পারেনা; আমার ভারি কষ্ট হয়।' বোঝো ঠ্যালা, বিদেশে গিয়েছে তো নিজের ইচ্ছেয়। আমি কি বলেছি যেতে?

কিন্তু এসব যুক্তি পার্বতীকে দেখিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া এতে লক্ষী, সরস্বতীও ইন্ধন যোগায়। হাজার হোক বিদেশের একটা মোহ আছে তো? গনশা অবশ্য এসব ব্যাপারে কিছু বলেনা, কিন্তু কার্তিকচন্দ্রও বিদেশ যাবার নামে এক পা বাড়িয়ে আছেন। বাবুর আবার সাজগোজের দিকে দারুণ ঝোঁক। খরচার কথা ভেবে সেদিন পার্বতীকে বলতে গিয়েছিলাম 'এবার কি বিদেশে না গেলে হয়না? দিনকালের যা অবস্থা, সব দিক সামলানো প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠেছে।' সেই শুনে পার্বতী বললেন - 'বাপরে বাপ, বছরে তো মাত্র একবারই যাই, তোমার যেন সেটাও সহ্য হয় না। আমি কি আর জানিনা দিনকাল যে খারাপ? সব ভেবে তাই ব্রিটিশ এয়ার এ যাবার ব্যবস্থা করেছি। ওটাতেই ভালো রিবেট পাওয়া যাচ্ছে এখন। তোমার কথা ভেবে বিলাসিতা তো প্রায় ছাড়তে বসেছি। 'ঐ আরেক ঝামেলা - সব কিছু করবে অথচ মুখে বলবে 'সব কিছুই ছেড়েছি।' কথা বাড়ালেই কথা বাড়ে তাই চুপ করে গেলাম। বাইরে হংস রাজের আওয়াজ হলো যেন, সরস্বতী বোধহয় বাড়ি ফিরলো। না, শুধু সরস্বতী নয়, দু'বোনই কলকল করতে করতে ঘরে ঢুকলো। আমার দিকে লক্ষ্যই নেই, কি সব কিনে এনেছে তাই দেখতেই

ব্যস্ত।

'এই দিদি, দেখি তোর বিকিনিটা বার করতো, আমার তো মনে হচ্ছে ওটাতে তোকে ঠিক মানাবে না।'

'কে বললে তোকে? সেদিন নারায়ণ বলছিল, কালো রঙে নাকি আমাকে দারুণ মানায়, তাই তো বেছে বেছে ওটাই কিনলাম।' বেশ গর্বিত হয়ে কথাটা বললো লক্ষী। 'আরে নারায়ণ দা তোকে সবকিছু পড়লেই বলে- ভালো দেখাচ্ছে, ওর কথা ছাড়।'

আজকাল আর ছেলেমেয়েদের মান্যমানতা বলে কিছু নেই, দিদির সঙ্গে সরস্বতী কেমন ভাবে কথা বলছে দেখ! কিন্তু বিকিনি নামক বস্তুটা দেখে আমি তো অবাক! চুপ করে না থাকতে পেরে বলে উঠলাম, 'এসব তোরা পরবি নাকি?' আমার বলার ধরন দেখে দু'বোন তো হেসেই অস্থির। 'তুমি যে কি বাবা, একদম কিচ্ছু জাননা। সাঁতার কাটতে গেলে বিদেশে এসব পরতেই হয়, তা না হলে জলে নামতেই দেবেনা।' আমি তো ভেবেই পাচ্ছিনা সাঁতার কাটতে গেলে ওসব ছাইভস্ম পরতে হবে কেন? আমাদের দেশের মেয়েরা কি আর শাড়ি পরে সাঁতার কাটে না? কিন্তু ওদের এসব বোঝানো যাবে না, তাই চুপ করে গেলাম। ওরাও নিমেষে প্রসঙ্গ পাল্টে দিল।

'এই দিদি মনে আছে সেবার শিকাগো তে কি ঠাণ্ডা ছিল?' মনে আবার নেই, এবার ওদিকে বেশি ঠাণ্ডা না পড়লেই রক্ষা। গতবার আবহাওয়ার জন্য ভালো করে বেড়ানোই হয়নি। এই ভারতী দেখি তোর জিন্স এর ফিটিংস টা কেমন? 'ধুর আমার আর এখন ওসব পড়তে ভালো লাগছেনা।' তাছাড়া এটাতো খুব সস্তায় কিনেছি, প্লেনে পড়বো বলে

আমেরিকায় গিয়ে গোটাকতক ডিজাইনার জিন্স কিনতে হবে। আচ্ছা দিদি তুই কটা শাড়ি নিচ্ছিস রে?'

এরা কি জামাকাপড় ছাড়া আর কিছু জানেনা? ভারতীর প্রশ্নের জবাব শোনার আগেই দুই ভাই হই হই করতে করতে ঘরে ঢুকল। কার্তিকচন্দ্রের হাতে যথারীতি দোকানের প্যাকেট, কিন্তু গণশার কথা শুনে মনে হচ্ছে দু'জনের মধ্যে ঝগড়াটা বেশ জমেছে।

ওদের দেখে কমলা বলে উঠল, 'তোদের নিয়ে আর পারা গেল না, আবার ঝগড়া বাধিয়েছিস? দিনে দিনে তোদের বয়স বাড়ছে না কমছে? 'গণেশ বেশ রাগ দেখিয়ে বলে উঠলো, জানিস কেতোটা কি বলেছে? আমেরিকায় নাকি আমার চেয়ে ওর পপুলারিটি বেশি। বাজে কথা বলার জায়গা পায় না।'

ভারতী বললে, তা হ'তেই পারে, তোরা কি পপুলারিটি কনটেস্টে নেমেছিস নাকি? 'ফোঁস করে উঠে গণেশ বললে,- হ'তে পারে মানে? চোখ, কান বন্ধ করে থাকিস নাকি? গত বার দেখিস নি আমার কদর ওখানে? আমার ষ্ট্যাচু দিয়ে ঘর সাজাচ্ছে, আমার ছবি কাপড়ে ছাপছে, আর আমার বাহনটির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে কিনা বল।'

এবার লক্ষী আর সরস্বতী দুজনেই একসাথে বলে উঠলো, 'তোর চাইতে তোর বাহনের কদরই কিন্তু বেশি। একটা ইঁদুরকে মিকি নাম দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত করে ফেলেছে আর এখন তো ঘরে ঘরে কম্পিউটারের সাথে একটা করে যান্ত্রিক ইঁদুর আছে, ওটা ছাড়া তো কোন কাজই হয় না আজকাল।'

কার্তিক দেখল কথার মোড়টা গনেশ এর দিকে ঘুরে যাচ্ছে, তাই প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য বলে উঠল, 'আমি ভাবছি এবার আমেরিকা থেকে একটা ব্লাকবেরি নিয়ে আসবো। ওটা বেশ কাজের জিনিস।'

এতক্ষণ মহাদেব চুপ করে ওদের কথা শুনছিলেন, এবার নড়েচড়ে উঠে কার্তিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমেরিকা থেকে এখানে পথের ধারে অনেক বেরি পাওয়া যায়, ওগুলোই খাও। তোমাদের আজকাল এক ধারণা হয়েছে, বিদেশের সবকিছুই ভালো।'

বাবার কথা শুনে ভাইবোনেরা একসাথে হেসে উঠল, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলনা বাবা, কোথায় যে থাক, যুগের সাথে একটু সম্পর্ক রাখবে তো? ব্লাক্‌বেরি মোটেই ফল নয়, একটা ইলেকট্রনিকস যন্ত্র, আজকাল খুব পপুলার।

এইরে এবার পালাতে হবে। এতক্ষণ তবু জামাকাপড় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, এখন এরা ইলেকট্রনিকস নিয়ে আলোচনা শুরু করলে কিছুই বুঝতে পারব না। তাছাড়া বেলাও প্রায় পরে এলো, এইবার একটু বেরোতে হবে, এই ভেবে মহাদেব দরজার দিকে এগোলেন। গেটের কাছে আসতেই পার্বতীর সাথে দেখা, একগাদা জিনিসপত্র কিনেছে মনে হচ্ছে। কোনরকমে প্যাকেট গুলো সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কিগো বেরোচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, সিদ্ধিটা প্রায় শেষ হয়ে এলো, যাই নিয়ে আসি গিয়ে, সন্ধ্যে হওয়ার আগে।' এই বলে মহাদেব সিদ্ধি কেনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পরলেন।

সংগৃহীত ও সম্পাদিত

MGi
Meghna Group of Industries
জেগেছে বাংলাদেশ
মাতারবাড়ি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
নির্মাণের প্রধান সহযোগী
Fresh CEMENT
HIGH PERFORMANCE CEMENT
ফ্রেশ
ফাউন্ডেশন ◀ স্ট্রাকচার ▶ ফ্লো

বিপদ এবং পাপ থেকে মুক্তিলাভ

রত্নেশ্বর দাস

নারায়ণকে নমস্কার করে উত্তম মানুষকে নমস্কার করা কর্তব্য। এভাবেই দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করে পরে জয়ধ্বনি করা উচিত। সত্যবতীর হৃদয়ে আনন্দ-দানকারী পরাশরের পুত্র ব্যাসের জয় হোক। ব্যাসের মুখপদ্ম নিঃসৃত অমৃতবাণী সমস্ত জগৎ পান করে। গতিহীন, অবিনশ্বর, শাশ্বত মহাত্মা জগৎপতি মহাদেবের শরণ নিচ্ছি। এই লোকের রচনাকরী, সর্বজ্ঞ, অপরাজিত, অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের নিয়ন্তা ব্রহ্মার শরণ নিচ্ছি। অনুপম যে জগৎপতির জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, চতুবর্গ, ধর্ম এবং ঐশ্বর্য়ের উৎস তিনিই। তিনি সৎ অসৎ ভাব দুটি দর্শন করেন প্রতিনিয়ত, তারপর ক্রিয়াভাবের অর্থরুপে ঈশ্বরে প্রবেশ করেন। প্রজাসৃষ্টিকারি, তত্ত্ববেত্তা তিনি যোগের সাহায্যে চরাচরের প্রাণীসমূহ সৃষ্টি করেন। যিনি পুরাণের আখ্যান জিজ্ঞাসু তিনি স্বয়ম্ভু, বিশ্বপতি, জ্ঞানপতি, লোকসাক্ষী প্রভুর শরণাপন্ন হন। সাবধানে ব্রহ্মা, বায়ু, মহেশ্বরকে নমস্কার করে সর্বশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং তার নাতি জাতুকর্ণকে এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করে ধর্ম, অর্থ এবং ন্যায়সম্মত বেদসম্মত ব্রহ্মা কর্তৃক উক্ত পুরাণ বলছিঃ-

অসীমকৃষ্ণ নামে এক রাজা ছিলেন। কী সুন্দর তাঁর শরীর, আর কি বীর্যবানই না ছিলেন তিনি, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এ পৃথিবীর। জীতেন্দ্রিয় তিনি শান্ত, দমনশীল সেই রাজা সংশয়ান্বিত হয়ে কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বতী নদীর তীরে দীর্ঘসত্র যজ্ঞ শুরু করলেন। সেই যজ্ঞের ঋষিরা ছিলেন শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত এবং নৈমিষারণ্যে ভ্রমণকারী। সর্বপুরাণজ্ঞ, তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন সুত সেই ঋষিদের দেখতে এসে সুন্দর কথা বলে সকলের মন আনন্দিত করে তুললেন। এই আনন্দ দান করার জন্যেই সুতের আরও একটি নাম হ'ল লোমহর্ষণ। এই লোমহর্ষণ আচারনিধি ধীমান তপস্বী বেদব্যাসের শিষ্য। সমস্ত পুরাণ, বেদসমূহ, মহাভারত, বিপুলা সরস্বতী ছিলেন তাঁরই মধ্যে আশ্রিত। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়সমুহই জানতেন তিনি, সুক্ত, পরিভাষা, ঔষধিসমূহ তাও অজ্ঞাত ছিল না এই সুতের। ন্যায়জ্ঞ সেই সুত ধীমানশ্রেষ্ঠ মুনিদের কাছে এসে কৃতাঞ্জলিপুটে নম্র প্রণতি জানালেন। সত্রযাজী ঋত্বিকেরা তাতে আনন্দিত হয়ে সুতের বন্দনা, অর্চনা করলেন। সব ঋষিদের মনেই পুরাণ কথা শোনার আগ্রহ জাগিয়ে দিলেন তিনি। লোমহর্ষণকে দেখেই তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে ইনি মহাপণ্ডিত এবং বিশ্বাসভাজন। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ গৃহপতি সুতকে ইঙ্গিত করলেন। গৃহপতি বললেন, আপনি তো ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ, ধীমান বেদব্যাসের পুরাণজ্ঞান আয়ত্ত করার জন্যে সাধনা করেছেন এবং তার কাছ থেকেই পেয়েছেন আপনার যথার্থ পুরাণজ্ঞান। মহাবুদ্ধি তুমি এই ঋষিপ্রধানদের পুরাণ শোনার ইচ্ছে পূর্ণ কর। এই মহান ঋষিরা নানা গোত্রের। এরা প্রত্যেকেই পুরাণ অনুসারে নিজেদের বংশবিবরণ জেনে নিন। তুমি সপুত্র মুনিদের পুরাণ শোনাবে বলেই এই যজ্ঞদীক্ষার আগে তোমাকে বরণ করেছিলাম। পুরাণজ্ঞ, সত্যব্রত সুতকে ঋষিরা এভাবেই পুরাণ বলার জন্যে প্রণোদিত করলেন। প্রাচীন সৎ-পুরুষেরাও সুতের ধর্ম দেখেছেন। অমিত বিক্রমী রাজা, দেবতা, মহাত্মা, ঋষি ইত্যাদির বংশাবলী জেনে যথার্থ উপস্থাপিত করাই তো সুতের ধর্ম। ব্রহ্মজ্ঞরা ইতিহাস পুরাণের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন সুতের অধিকার, বেদে তার অধিকার কোথাও শোনা যায় না। বেণের পুত্র পৃথুর যজ্ঞে সুত্যা থেকেই প্রথমে সুতের উৎপত্তি। সুতেরা বর্ণসংকর। ঐ যজ্ঞে ইন্দ্রের হবির সঙ্গে বৃহস্পতির হবি মিশে যায়, এবং সেই হবি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়। তাতে সুত জন্মায়। শিষ্যের হব্যে গুরুর হব্য মিশেছিল বলে অধরোত্তর ক্রমে বর্ণসংকর সুতের উৎপত্তি হয়। ক্ষত্র থেকে ব্রাহ্মণের চেয়ে নিচু জাতের গর্ভে জন্ম হওয়ায় সাধর্মক্রমে সুত পুর্বের সঙ্গে তুল্যধর্ম বলেই বিখ্যাত।

এই ক্ষত্রবৃত্তি সুতের মধ্যম ধর্ম। রথ, নাগ, অশ্ব চালনা বা চিকিৎসা সুতের জঘন্য ধর্ম। আপনারা ব্রহ্মজ্ঞ, যথার্থই আপনারা আমার স্বধর্ম জিজ্ঞেস করেছেন। অতএব ঋষিপুজিত পুরাণ কথা কেন বলব না? পিতৃগণের বাসবী নামে এক মানসকন্যা ছিল। পিতৃগণের দ্বারা সে অপব্যাত হয়ে মৎস্যযোনীতে জন্মায়। অরণি যেমন আগুনের জন্মের কারণ, তেমনি সেই বাসবীই বেদব্যাসের জন্মকারণ। সর্ববিদ্যাপারংগম বেদব্যাস মৎস্যকন্যার গর্ভে জন্মান। আমি সেই পুরাণপুরুষ মানুষরুপী বিষ্ণুকে স্মরণ করে পুরাণকথা আরম্ভ করব। তিনি জন্মানো মাত্র ষড়ঙ্গ সহ বেদ আয়ত্ব করেছিলেন। জাতুকর্ণ তাঁকে বেদবিদ্যা দান করেন। শ্রুতিসাগর মন্থন করে, নিজের মতিকে মন্থনদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে মহাভারতের মতো চন্দ্রিমাটিকে প্রকাশ করেছিলেন। যথাসময়ে যথার্থ মাটি পেয়ে যেমন গাছ বহু শাখা-প্রশাখায় মহীয়ান হয় তেমনি সর্বজ্ঞ, দেবপূজিত, দীপ্ততেজা, ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষির মুখে পুরাণ শুনে এখন বায়ু পুরাণ বলব।

পূর্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিরা বায়ুর কাছে এই পরাণ জানতে চান। তাই বায়ু এই পুরাণ তাদের বলেন।

পরমপুরুষ, চতুর্বাহু চতুর্মুখ, অপ্রমেয়, স্বয়ম্ভু, সর্বহেতু ঈশ্বর সেই মহেশ্বরই এই সৎ এবং অসৎ সমষ্টি জগৎ নির্মাণ করেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমে একটি সোনার ডিম আবির্ভূত হয়। সেই ডিমের আবরণ জল; জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ভুত প্রভৃতিতে, ভুতসমূহ মহতে, মহৎ আবার অব্যক্তে ঢাকা থাকে। আদি যে সৃষ্টিক্রম তা এভাবেই বলা হয়েছে।

যাই হোক, এরপর এই পুরাণে বিশ্বদেব এবং ঋষিদের বিবরণ নিরূপণ, নদী এবং পর্বতগুলির প্রাদুর্ভাব, সব মন্বন্তর এবং কল্প বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্ম, ক্ষত্র ও ব্রহ্ম জন্মকীর্তন, ব্রহ্মের স্রষ্টারূপ এবং প্রজাসৃষ্টি বর্ণনা করা হয়েছে ক্রমান্বয়ে। তারপর অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার অবস্থাকীর্তন এবং কল্প, বৎসর ও জগৎ স্থাপন, হরিশয়ন, পৃথিবীর উদ্ধার, পুরসন্নিবেশ, বর্ণাশ্রম বিভাগ উপস্থাপিত হয়েছে। এরপর গৃহসংস্থ গাছের বিনাশ, যোজন ও পথগুলির বিস্তৃতি, মর্ত্যবাসীদের স্বর্গে স্থান নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এরপর বৃক্ষ, ওষধি ও লতারাজির উৎপত্তি, মানুষের বৃক্ষত্ব এবং নারকীয় কীটত্ব কীর্তন, দেবতা ও ঋষিদের দুরকমের পদবী কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অন্ন প্রভৃতি এবং তনু ইত্যাদির সর্জন এবং বিসর্জন, তারপর সবশাস্ত্রের মধ্যে পুরাণেরই প্রথম বিভাজন বর্ণিত হয়েছে। তারপর বক্তব্যগুলি ধর্মশাস্ত্র এবং অন্যান্য ব্রত নিয়মগুলির আবির্ভাব, পশু এবং পুরুষদের উৎপত্তি, কল্প নির্বাচন, কল্প পরিগ্রহ, ব্রহ্মার নয় রকমের অবুদ্ধিজনিত সৃষ্টি, বুদ্ধিপুর্বক তিন রকমের সৃষ্টি, তারপর লোককল্পনা, ব্রহ্মার শরীর থেকে ধর্ম প্রভৃতির উৎপত্তি, দু'টি কল্পের মধ্যস্থল ও প্রতিসন্ধি, তমোমাত্রে আবৃত হওয়া ব্রহ্ম থেকে অধমের উৎপত্তি, তারপর শতরুপার জন্ম বিবৃত হয়েছে। তারপর প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, প্রসূতি, আকূতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাবান নিষ্পাপ ব্যক্তিদের বিবরণ এবং আকূতির গর্ভে প্রজাপতি রুচির মিথুন উৎপত্তি, প্রসূতির গর্ভে দক্ষকন্যাদের উৎপত্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি দক্ষকন্যার সাত্বিক ধর্মেও সুখজনক সৃষ্টি, হিংসার গর্ভে অধর্মের অশুভলক্ষণ তামস সৃষ্টি, সতীর গর্ভে মহেশ্বরের প্রজাসৃষ্টি, ব্রহ্মার নিরাময় প্রাপ্তি বর্ণিত হয়েছে। তারপর মুক্তিকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণদের জন্যে যোগনিধির যোগক্রম কীর্তন, রুদ্রের অবতার ও মহাভাগ্য কথা, তিনটি বেদের কথা, ব্রহ্মা ও নারায়ণের পরম উদার সম্পর্ক, ব্রহ্মা এবং নারায়ণের মহেশ্বর স্তব, তাঁদের স্তবে শিবের সন্তুষ্টি, মহাত্মা ব্রহ্মার অঙ্গে রুদ্রের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। তারপর তাঁর কান্নার জন্যে রুদ্রের আটটি নাম দেওয়া এবং রুদ্র প্রভৃতির দ্বারা এই চরাচর ব্যাপ্তি বর্ণিত হয়েছে। এরপর ভৃগু ইত্যাদি ঋষিদের, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রগুলির বর্ণনা, স্বাহার গর্ভে অগ্নির প্রজাসৃষ্টি, স্বধা থেকে দু'রকমের পিতৃগণের সৃষ্টি, পিতার বংশ প্রসঙ্গে মহেশ্বর থেকে সতীর জন্যে দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিদের প্রতি অভিশাপ বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এরপর অদ্ভুতকর্মা দক্ষের রুদ্রকে শাপ দেওয়া, বিস্তৃতভাবে শক্র নির্যাতন কথা, দ্বীপ এবং দেশগুলিতে তাদের পৃথক পৃথক বিনিয়োগ, স্বায়ম্ভুবের সৃষ্টি বর্ণনা, মহাত্মা নাভি এবং রজার সৃষ্টি কথা; দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্বতের বর্ণনা, বৎসর, নদী ও তাদের ভেদ, সাতটি দ্বীপের হাজার হাজার দ্বীপভেদ, জবুদ্বীপ এবং সমুদ্রের মণ্ডল থেকে পর্বতগুলির বর্ণনা ক্রমান্বয়ে করা হয়েছে। হিমবান, হেমকূট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত, শৃঙ্গবান, প্রভৃতি পর্বতগুলির বিবরণ, এবং সেগুলির নানা বিস্তৃতি ও সেই সেই পর্বতবাসী অধিবাসীদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

স্থাবর জঙ্গমের প্রাণীসমূহের, ভরত প্রভৃতি বর্ষগুলির বিবরণ, সাতটি সমুদ্রের জম্বু, প্রভৃতি দ্বীপ ঘিরে রাখার বর্ণনা, তার পরে জলাভূমি, লোকালোক পর্বতগুলির বর্ণনা আছে। ডিম্বের শেষভাগে এই লোকসমূহ, সাতটি দ্বীপসমন্বিত পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থান, নানা প্রাকৃত আবরণের সঙ্গে ভূপ্রভৃতির, সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবীর অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। মানসের উত্তরে শৈলশীর্ষে মহেন্দ্র প্রভৃতির পুণ্য সভা বর্ণনা, তারপর স্বর্গের অলাতচক্রের মতো গতি নিরুপণ করা হয়েছে। এরপর নাগবীথী এবং অজবীথীর লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর চতুর্দিকের উপরে লোকপালদের নাম নিরুপণ করে, পিতৃ এবং দেবগণের দক্ষিণোত্তর পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর রজোগুণ এবং সত্তগুণের আশ্রয়ী গৃহী এবং সন্ন্যাসীদেরও দু'রকম পথের কথা, ধর্ম প্রভৃতির অধিষ্ঠান বিষ্ণুপদ কীর্তন, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর সঞ্চার বর্ণনা, ধ্রুবসামর্থে প্রজাদের শুভাশুভ নিরুপণ ক্রমান্বয়ে করা হয়েছে।

স্বয়ং ব্রহ্মা প্রয়োজনবশত যে সৌরধারা নির্মাণ করেন, দিবাকর তাতে আকাশ পথে ভ্রমণ করেন, এই সৌরধারা বিবরণের পর জলসারময় চন্দ্ররথের বিবৃতি স্থান পেয়েছে। এতে দেবতা, আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, রথকার, সাপ ও রাক্ষস থাকে। এরপর সূর্যের জন্যে যে চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি হয় তা বলা হয়েছে। ধ্রুব থেকে সূর্য প্রভৃতির ধারাগুলির কীর্তন এবং পরে শিশুমারের বিবরণও দেওয়া হয়েছে। তার লেজে যে ধ্রুবের অবস্থিতি সে কথাও বলা হয়েছে। গ্রহগণের সঙ্গে তারারুপী সব নক্ষত্রের বিবরণ আর সেখানে পুণ্যকাবী দেবতাদের বাসের কথা বলা হয়েছে। সূর্যের হাজার রশ্মিতে শীত এব গ্রীষ্ম ইত্যাদি হওয়ার কথা বলা হয়েছে ক্রমানুসারে। কর্ম এবং অর্থ অনুসারে রশ্মিগুলির বিভাগ বর্ণনা করা হয়েছে। সূর্যের সংস্পর্শে এসে গ্রহগুলির পরিণাম এবং গতি নিরুপণ, বিষ খেয়ে শম্ভুর শীঘ্রই নীলকণ্ঠ হওয়ার বর্ণনা ক্রমে স্থান পেয়েছে। এরপর ব্রহ্মাপ্রসাদিত হয়ে

শুলপাণির বিষ খাওয়া, দেবতাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট বিষ্ণুর মহেশ্বর বন্দনা, সব পাপনাশকারী পাবনী লিঙ্গোদ্ভবকথা, বিশ্বরুপ থেকে প্রধানের অদ্ভুত পরিণাম, ঐল পুরূরবার মাহাত্ম্যের কথা, দু'রকম পিতৃপুরুষের তর্পণ বর্ণনা করা হয়েছে ক্রমানুসারে। এরপর পর্ব এবং পর্বসন্ধিগুলির বর্ণনা, স্বর্গগামী এবং অধোগামী পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে বিশেষ সুযোগ পাওয়ার কথা, যুগসংখ্যা প্রমাণের কথা, কৃত এবং ত্রেতাযুগ প্রভৃতির বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর বর্ণ এবং আশ্রমগুলির সংখ্যা প্রবর্তনা, ধর্ম অনুসারে বর্ণ এবং আশ্রমগুলির সংস্থান, যজ্ঞ প্রবর্তন, বসুর সঙ্গে ঋষিদের কথোপকথন, বসুর নিম্নগতির কথা, স্বায়ম্ভুব মনু ছাড়া প্রশ্নগুলির অনুত্তরযোগ্যতা, তপস্যার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সব যুগগুলির বার্তা এবং সংক্ষেপে দ্বাপর ও কলির বর্ণনা, দেবতা, তির্যগযোনী ও মানুষের যুগপ্রতি প্রমাণ নিরুপিত হয়েছে ক্রমান্বয়ে। যুগের প্রভাবে প্রাণীদের পরিণাহ, উচ্ছ্রায় এবং আয়ুর বর্ণনা, শিষ্ট প্রভৃতির নির্দেশ এবং প্রাদুর্ভাব কথাও বর্ণনা হয়েছে।

এরপর বেদ এবং বেদমন্ত্রগুলির কীর্তন, বেদের শাখাগুলির কথা, বেদব্যাস ইত্যাদি শব্দের বুৎপত্তি, মন্বন্তরগুলির সংহার ও সংহারের পর আবার সেগুলির উদ্ভব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর ক্রমে দেবতা, ঋষি, মনু এবং পিতৃগণের বিস্তৃত উদ্ভবকথা বলা হয়েছে সংক্ষেপে। মানুষ মানে মন্বন্তরসংখ্যা নিরুপণ, সব মন্বন্তরেরই ঐসব লক্ষণ কীর্তন বর্তমান, অতীত ও অনাগত মন্বন্তরগুলির বর্ণনা, সেগুলির প্রতিসন্ধির লক্ষণ, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরবার্তা, তিনটি মন্বন্তর ও কালজ্ঞান বর্ণনা করা হয়েছে ক্রমান্বয়ে। এরপর মন্বন্তরের দেবতা ও প্রজাপতির নাম বর্ণনা, প্রজাপতি দক্ষের দায়িতা, কন্যা এবং নাতনাতনিদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। পরে মেরু গিরিতে বাসকারী সবর্ণ প্রভৃতির বর্ণনা, উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের প্রজা সৃষ্টির বর্ণনা, বেণের পুত্র পৃথুর পৃথিবী দুয়ে ফেলার বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর ক্রমে ব্রহ্মাপ্রভৃতির পুর্বে পৃথিবীদোহন বিবরণ, সারিষার গর্ভে দশপ্রচেতা থেকে সোমের অংশ দক্ষপ্রজাপতির জন্ম বর্ণনা ও মহেন্দ্রদের ভুত, ভাবী ও ভবেশত্ব কথা স্থান পেয়েছে।

ক্রমে আগামী মনুদের বহু আখ্যান কথা, বৈবস্বত মনুর সৃষ্টিবিস্তৃতি বর্ণনা, যজ্ঞে মহাদেবের বারুণী ধনু ধারণ করা বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মের শুক্র থেকে ভৃগু প্রভৃতির উৎপত্তি, চাক্ষুষ মনুর প্রজা সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলে বৈবস্বত মন্বন্তরে ধ্যানযোগ দক্ষপ্রজাপতির প্রজাসৃষ্টি কথা বর্ণনা করা হয়েছে ক্রমান্বয়ে। নিজের অভিশাপের জন্যে ব্রহ্মার পুত্র নারদের মহাবলী দক্ষপুত্রদের হত্যা, তারপর দক্ষ থেকে বীরিণার গর্ভে বিখ্যাত দক্ষকন্যাদের উৎপত্তি, ধীমান কশ্যপের ধর্ম সর্গ কথা বলা হয়েছে ক্রমান্বয়ে। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের একত্ব, প্রথকত্ব এবং বিশেষত্ব বর্ণনা, ব্রহ্মার দেবতাদের অভিশাপ দেওয়া, দিতির গর্ভে মরুদ্গানের উদ্ভব, দেবতাগণের সঙ্গে তাঁদের সম্ভাব এবং দেবত্বপ্রাপ্তি: মরুদ্গাণের ঊনপঞ্চাশটি সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে। এরপর ক্রমান্বয়ে পিতার কথামতো তাদের দেবত্ব ও বায়ুর কাঁধে আশ্রয়লাভ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, সব ভূতগুলি, পিশাচ, পশু, পাখি, লতা ও অপ্সরাদের বিস্তৃত উৎপত্তি কথা, সমুদ্র থেকে ঐরাবতের জন্মবৃত্তান্ত, গরুড়ের উৎপত্তি ও অভিষেক বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, পুলস্ত্য মহাত্মা অত্রি ও পরাশর মুনির সৃষ্ট প্রজাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। পরে দেবতা ও ঋষিদের প্রজা উৎপত্তির বিবরণ, সবলোকের প্রসবিত্রী তিনকন্যার বিবরণ, সুমহান পাঁচ দেবতাদের জন্ম ও পিতার দৌহিত্র নির্দেশ, ইলা ও আদিত্যের বিস্তৃত বিবরণ; বিকুক্ষির চরিত্র্যব্যাখ্যান এবং ধুন্ধুর নির্বহণ বর্ণিত হয়েছে। তারপর ইক্ষ্বাকু থেকে শুরু করে বৃহদ্বল পর্যন্ত সব রাজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, নিমী প্রভৃতি রাজাদের বিবরণ, রাজা যযাতির বিস্তৃত কথা, যদুবংশ কীর্তন, হৈহয়ের বিস্তৃত বিবরণ, ক্রোষ্টুর পরবর্তী বংশধরদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরপর জ্যামঘের মাহাত্ম্য ও প্রজাসৃষ্টির বর্ণনা, দেবায়ুধ, অর্ক ও মহাত্মা বৃষ্ণি ইত্যাদির বিবরণ, অনমিত্র বংশ কথা, বিষ্ণুর দিব্যাভিশাস্ত, বুদ্ধিমান বিবস্বানের মণিরত্ব পাওয়া, যুধাজিতের প্রজাসৃষ্টির বর্ণনা, রাজর্ষি দেবমীঢুষের সুসমৃদ্ধ বংশ বর্ণনা এবং ঐ মহাত্মার আবার উৎপত্তি ও চরিতোপাখ্যান, বংশের দৌরাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পরে দেবকীর গর্ভে ব্যাসদেব নামে বিষ্ণুর একান্তে জন্ম বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর পরবর্তী প্রজাসৃষ্টির কথা, দেবতা ও অসুরের সংঘর্ষে বিষ্ণুর স্ত্রীবধ এবং ইন্দ্রের জীবনরক্ষা, বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে।

এরপর ভৃগুর শুক্রমাতার উত্থাপন, সুর ও অসুরদের বারো বছর ব্যাপী সংগ্রাম, নরসিংহ প্রভৃতি দৈত্যপ্রাণনাশী অবতার কথা। শুক্রের তপস্যা ও স্থাণুর আরাধনা, বরদানে লোভী হয়ে শুক্রের মহাদেব স্তুতি, সুরাসুরের কাজ নির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মা শুক্র জয়ন্তীর সঙ্গে আসক্ত হলে বুদ্ধিমান বৃহস্পতির অসুরদের মোহগ্রস্ত করার কথা, শুক্রের অভিশাপ দেওয়া, বিষ্ণুর মহাত্ম্য বর্ণনা ও তার জন্মের বিবরণ বিবৃত হয়েছে ক্রমান্বয়ে। এরপর যযাতি থেকে শুক্রদৌহিত্র যদু তুর্বসু, অনু, দ্রুহ্য ও পুরু প্রভৃতির কথা, এই বংশে যেসব বলবীর্যশালী, কীর্তিমান রাজা ছিলেন তাদের বিবরণ, বিপ্রর্ষি কুশিকের যথাযথ ধর্মসংশ্রয় বর্ণনা, সুরতির শাপ দেওয়া, জহ্নুবংশ কথা, শান্তনুর বীর্যব্যাখ্যা, ভবিষ্যৎ রাজাদের উপসংহার বর্ণনা করা হয়েছে। পরে দু'টি পরার্ধের লক্ষণ, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক এই

তিন রকমের প্রলয়ের কথা, সূর্য থেকে অনাবৃষ্টি ও সংবর্ত নামে অনলের উৎপত্তি বর্ণনা করা হয়েছে। ক্রমে বর্ষায় একর্ণবীভাব, বায়ুপ্রবাহ ও ব্রাহ্মরাত্রির সমাগম এবং তাদের সংখ্যা ও লক্ষণ বর্ণনা, ভূ ইত্যাদি সাতটি লোকের বর্ণনা, রৌরব প্রভৃতি পাপগুলির বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। তারপর প্রলয়ের সময় সব জীব যেখানে যায়, ব্রহ্মলোকের ওপরে শিবের জায়গা নির্দেশ করা, সব প্রাণীর পরিণাম, ব্রহ্মার প্রতিটি সৃষ্টির পরে প্রাণীদের সংহার করার করার কথা সবই বর্ণিত হয়েছে।

প্রাণের যে আটরকমের ভেদ আছে, ধর্ম এবং অধর্মের আশ্রয়ে ঊর্ধ্ব ও অধোগতির বর্ণনা, প্রতিকল্পে মহাভূতগণের ও সংহার বর্ণনা করা হয়েছে বায়ু পুরানে। দুঃখের প্রসংখ্যা, ব্রহ্মার অনিত্যত্ব, ভোগের দৌরাত্ম্য ও পরিণাম নির্ণয়, মোক্ষের দুর্লভতা, বৈরাগ্যবশে সংসারের দোষ দেখা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রপঞ্চের অতীত ব্রহ্মকেই শুদ্ধ সত্ত্বেও আশ্রয়রুপে কীর্তন করা হয়েছে ক্রমে ক্রমে। এর পর তিনটি তাপের অতীত নীরুপাখ্য নিরঞ্জন, আনন্দময় ব্রহ্মস্বরুপের বর্ণনা, আবার ব্রহ্মার আগেরই মতো এক সৃষ্টির কথা, সব পাপনাশকারী ঋষিবংশ কথা, পুরাণ সম্পর্কে ইতিকর্তব্যতা নির্ণয় বর্ণনা করা হয়েছে। জগতের সবরকমের প্রলয়বিক্রিয়ার কথা, ভূতগুলির প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ফলকথা, বশিষ্টের প্রাদুর্ভাব, শক্তির জন্ম, বিশ্বামিত্রের উত্তেজনায় সৌদাসের নিগ্রহ, পরাশরের উৎপত্তি, পিতৃগণের কন্যাতে ব্যাসমুনির জন্ম, শুকের উৎপত্তি, পরাশরের প্রতি বিশ্বামিত্রের দ্বেষ, বিশ্বামিত্রকে হত্যার করার জন্যে বশিষ্ঠের আগুন সংরক্ষণ, বিশ্বামিত্রের হিতৈষণায় দৈববিধি অনুসারে ধীমান স্কন্দের সন্তানের জন্যে অনুষ্ঠান, ভগবান ব্যাসের বেদ বিভাগ স্থান পেয়েছে বায়ুপুরাণে।

তার শিষ্য ও প্রশিষ্যদের প্রশ্ন অনুসারে ষড়গুণ্য প্রয়োগ সহ বেদের বিভিন্ন শাখা প্রকাশ বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র দেশ পাওয়ার ইচ্ছেয় ব্রহ্মার কাছে ধর্মাকাঙ্ক্ষী মুনিদের প্রশ্ন তার উত্তরে মুনিদের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রহ্মার কথা, এই সুনাভ, সত্যাঙ্গ, শুভবিক্রম অনুপম দিব্যরুপ নামে চক্র আছে, আপনারা অতাশ্রিত হয়ে এর পেছনে পেছনে যান, তাহলেই হিতকর দেশ পাবেন। এই ধর্মচক্র যেতে যেখানে গিয়ে এর নেমি শীর্ণ হবে, তাকেই পুণ্যদেশ বলে মনে করবেন। মুনিদের এই কথা বলে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন।

এরপর গঙ্গার গর্ভ সমাহার, নৈমিষেয়ত্ব কথা, নৈমিষারণ্যে মুনিদের যজ্ঞারম্ভ, শরদ্বানের মৃত্যু, ঋষিদের আবার উত্থাপন, নৈমিষেয় ঋষিদের পরমশ্রদ্ধায় ঐড় রাজাকে সমগ্র পৃথিবীর রাজা হিসেবে বরণ করে অতিথিজনের মতো সৎকার। আতিথ্যে প্রীত রাজাকে প্রচ্ছন্নমূর্তি ক্রুর অসুর স্বাভনির হরণ। ঋষিদের ঐড় রাজাকে অনুসরণ এবং কলস্প গাঁয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে রাজার দেখা পাওয়া বর্ণিত হয়েছে। ঋষিদের চেষ্টায় আবার যজ্ঞক্ষেত্রে রাজার আগমন, নৈমিষেয় ঋষিদের বারো বছরের যজ্ঞে সব যজ্ঞীয়পাত্র সোনার দেখে ঐড় রাজার ঝগড়া বর্ণিত হয়েছে ক্রমান্বয়ে। ঐ বিবাদে ঋষিদের প্রত্যাখ্যান, অরণ্যের প্রান্তে ঐড়ের পুত্র আয়ুকে উৎপাদন করে তাঁদের যজ্ঞ সমাধান ও ঋষিদের আয়ুরাজার সমাদর বর্ণনা করা হয়েছে। ঋষিরা বললেন, হে ব্রাহ্মণেরা এসব বিবরণ এই পুরাণে যথাযথ করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ পুরাণে ঋষিদের অনুত্তম লোকতন্ত্রতা, ব্রহ্মার পুরাপ্রোক্ত অনুত্তম জ্ঞানোৎপাদ পুরাখ্যান, ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুগ্রহ বিলানোর জন্যে রুদ্রাবতার, পাশুপত যোগ ও নানাস্থান এবং লিঙ্গোদ্ভব দেবের নীলকণ্ঠত্ব, ব্রহ্মবাদী বায়ুর ব্রাহ্মণদের কাছে এইসব পৌরাণিক বৃত্তান্ত বলেন। এ পুরাণ ধন্য, যশস্য, আয়ূষ্য পুণ্য ও পাপনাশক। এর কীর্তন, শ্রবণ বিশেষত ধারণ বেশী পুণ্যদায়ী। এই উপক্রমণিকা অনুসারেই এ পুরাণ কীর্তিত।

এ পুরাণের সংক্ষিপ্ত বার্তা শুনলেও মহান অর্থ লাভ হয়ে থাকে। অতএব আগে কিছুটামাত্র বলে পরে বিস্তারিত বলছি। যে জিতেন্দ্রিয় মানুষ এর আদি পাদও যথাযথ পাঠ করে, সব পুরাণই তার অধীত হয়। যিনি সঙ্গে উপনিষৎ চারিটি বেদ পড়েছেন কিন্তু পুরাণ সম্পর্ক কিছুই জানেন না সেরকম লোক বিচক্ষণ হতে পারেন না। ইতিহাস এবং পুরাণের সাহায্যে বেদের জ্ঞান উপচিত করে নিতে হয়। অন্যথা "আমাকে এ লোক মারবে" এই মনে করে স্বল্পজ্ঞানীর কাছে শ্রুতি ভীত হয়ে থাকেন। সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু এই অধ্যায়ের বক্তা। যিনি এই অধ্যায় অভ্যাস করেন তিনি বিপদ থেকে মুক্তি পান, তাঁর যথেষ্ট গতি লাভ হয়। পুরাকালে এ ছিল বলেই এর নাম পুরাণ। পুরাণ শব্দের এই নিরুক্তি যে জানে, তারও সব পাপ থেকে মুক্তিলাভ হয়। ভগবান নারায়ণ এই নিখিল বিশ্বে বিরাজ করছেন। সেই জগৎস্রষ্টারও স্রষ্টা দেব মহেশ্বর। অতএব এটা শুনে রাখুন যে মহেশ্বরই এই পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনিই সৃষ্টিকালে সব সৃষ্টি করেন এবং সংহারকালে তিনিই আবার সব সংহার করেন।

(বায়ু পুরাণ থেকে সংগৃহীত)

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দির, কলসকাঠী, বরিশাল

HOYA
SURGICAL OPTICS

THE FASTEST GROWING
IOL COMPANY IN THE WORLD

Sontosh Chandra Nath

Managing Director & CEO
Alpha Vision Limited

Member
- Switzerland Bangladesh Chamber of Commerce & Industry
- Transparency International Bangladesh -TIB
- Apex Bangladesh Foundation
- The Comilla Club
- Iskcon

Secretary General
- Ophthalmic Products Importers & Owners Association of Bangladesh

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : ধর্মচিন্তা

প্রদীপ কুমার সাহা

ধর্মের অর্থ

মানুষের উপর একটা মস্ত সমস্যার মীমাংসা ভার পড়িয়াছে। তাহার একটা বড়োর দিক আছে, একটা ছোটোর দিক আছে। দুইয়ের মধ্যে একটা ছেদ আছে, অথচ যোগও আছে। এই ছেদটাকেও রাখিতে হইবে অথচ যোগটাকেও বাড়াইতে হইবে। ছোটো থাকিয়াও তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে গিয়া মানুষ নানা রকম চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছে--কখনো সে ছোটোটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, কখনো বড়োটাকে স্বপ্ন বলিয়া আমল দিতে চায় না। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাই তাহার সকল চেষ্টার মূল। এই সামঞ্জস্য যদি না করিতে পারা যায় তবে ছোটোরও কোনো অর্থ থাকে না, বড়োটির নিরর্থক হইয়া পড়ে।...

...মানুষের নানা অঙ্গপ্রতঙ্গ, নানা ইন্দ্রিয়বোধ, তাহার নানা বৃত্তিপ্রবৃত্তি, এ সমস্তই মানুষকে কেবলই বিচিত্রের মধ্যে বিস্তারের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই বিচিত্রের শেষ কোথায়?...

কিন্তু মানুষের পক্ষে কেবলই কি এই গুণাহীন বৈচিত্র্যেও মধ্যে বিরামহীন ব্যাপ্তিই আছে? কোনোখানেই তাহার পৌঁছানো নাই? অন্তহীন বহু কেবলই কি তাহাকে এক হইতে দুই, দুই হইতে তিনের সিঁড়ি বাহিয়া লইয়া চলিবে--সে সিঁড়ি কোথাও যাইবার নাম করিবে না?

এ কখনো হইতেই পারে না। আমরা জগতে এই একটি কাণ্ড দেখি--গম্যস্থানকে আমরা পদে পদেই পাইতেছি। বস্তুত আমরা গম্যস্থানেই আসিয়া রহিয়াছি--আমরা গম্যস্থানের মধ্যেই চলিতেছি। অর্থাৎ যাহা পাইবার তাহা আমরা পাইয়া বসিয়াছি, এখন সেই পাওয়ারই পরিচয় চলিতেছে। যেন আমরা রাজবাড়িতে আসিয়াছি--কিন্তু কেবল আসিলেই তো হইল না--তাহার কত মহল কত ঐশ্বর্য কে তাহার গণনা করিতে পারে? এখন তাই দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি। এইজন্য একটু করিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাতেই সমস্ত রাজপ্রাসাদের পরিচয় পাইতেছি। ইহাকে তো পথে চলা বলে না। পথে কেবল আশা থাকে, আস্বাদন থাকে না। আবার যে পথ অনন্ত সেখানে আশাই বা থাকিবে কেমন করিয়া?

তাই আমি বলিতেছি আমাদের কেহ পথে বাহির করে নাই--আমরা ঘরেই আছি। সে ঘর এমন ঘর যে, তাহার বারাণ্ডায় ছাদে দালানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে আর শেষ করিতে পারি না অথচ সর্বত্রই তাহার শেষ; সর্বত্রই তাহা ঘর, কোথাও তাহা পথ নহে।...

ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি এই যে দুটি তত্ত্ব সর্বত্র একসঙ্গেই বিরাজ করিতেছে আমাদের মধ্যেও নিশ্চয় ইহার পরিচয় আছে। আমরাও নিশ্চয় আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য অনন্ত জীবনের প্রান্তে পৌঁছিবার দুরাশায় অপেক্ষা করিতেছি না। এ কথা বলিতেছি না যে, এখনও যখন আমার সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়া বুকিয়া যায় নাই, তখন আমি আপনাকে জানিতেছি না। বস্তুত আমার মধ্যে একদিকে চলা, এবং আর একদিকে পৌঁছানো, একদিকে বহু, আর একদিকে এক, এক সঙ্গেই রহিয়াছে, নহিলে অস্তিত্বের মতো বিভীষিকা আর কিছুই থাকিত না। একদিকে আমার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে, আর একদিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

এই যেখানে মানুষের আপনার আনন্দ--এইখানেই মানুষের পর্যাপ্তি, এইখানেই মানুষ বড়ো। এইখান হইতেই গতি লইয়া মানুষের সমস্ত শক্তি বাহিরে চলিয়াছে, এবং বাহির হইতে পুনরায় তাহারা এইখানেই অর্ঘ্য আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।...

...চলিবার চেষ্টাই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, তবু তো দেখি শিশু চলিতে পারে না। সে বারংবার পড়িয়া যায়। কিন্তু এই অক্ষমতা হইতে এই পড়িয়া যাওয়া হইতেই আমরা তাহার স্বভাব বিচার করি না। বরঞ্চ এই কথাই আমরা বলি যে, শিশু যে বারবার করিয়া পড়িতেছে আঘাত পাইতেছে তবু চলিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতেছে না ইহার কারণ চলাই তার স্বভাব--সেই স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে, সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যে, তাহার চলার চেষ্টা রহিয়া গিয়াছে। শিশু যখন মাটিতে গড়াইতেছে তখন পৃথিবীর আকর্ষণ কেবলই তাহাকে নিচে টানিয়া টানিয়া ফেলিতেছে তখনও তাহার স্বভাব এই প্রকৃতির আকর্ষণকে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছে--সে আপনার শরীরের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চায়--টলিয়া টলিয়া পড়িতে চায় না;--ইহা তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নহে, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এইজন্য প্রকৃতি যখন তাহাকে ধূলায় টানিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহার স্বভাব তাহাকে উপরে টানিয়া রাখিতে চাহে। সমস্ত টলিয়া পড়ার মধ্যে এই স্বভাব তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না।

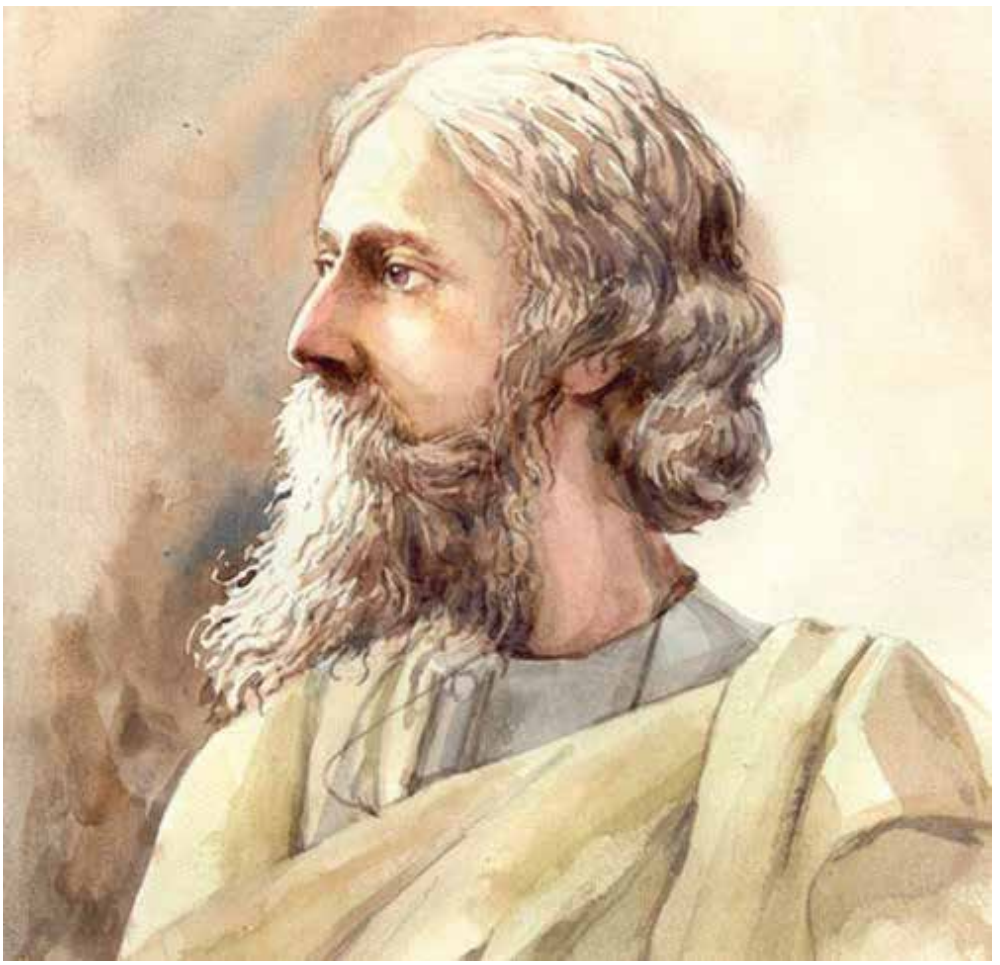

আমার ধর্ম আমাদের সেইরূপ স্বভাব। প্রকৃতির উপরে সকল দিক হইতে আমাদিগকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য সে কেবেলই চেষ্টা করিতেছে--যখন ধূলায় লুটাইয়া তাহাকে অস্বীকার করিতেছি তখনও অন্তরের মধ্যে সে আছে। সে বলিতেছে আপনার স্থিতিকে পাইতেই হইবে, তাহা হইলেই গতিকে পাইবে--দাঁড়াইতে পারিলেই চলিতে পারিবে। আপনাকে পাইলেই সমস্তকে মূলে গিয়া পাইবে। তখন তোমার সমস্ত জীবন প্রাকৃতিক হইবে না, স্বাভাবিক হইবে। স্বভাবে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃতি তখন তোমার অনুগত হইবে। তখনই তোমার ধর্ম সার্থক হইবে--তখনই তুমি তোমার চরিতার্থকে পাইবে।

এই চরিতার্থতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষ বাহির হইতে যাহা কিছু পাইতেছে, তাহাতেই তাহার অন্তরতম ইচ্ছা মাথা নাড়িয়া বলিতেছে--যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই চরিতার্থতা হইতে, এই পরিসমাপ্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে যাহা কিছু দেখিতেছে তাহার মধ্যে সে মৃত্যুকেই দেখিতেছে--কেবল বিচ্ছেদ, কেবল অবসান; প্রয়োজন আছে তাহার আয়োজন পাই না, আয়োজন আছে তাহার প্রয়োজন চলিয়া যায়। এ যে মৃত্যুকে দেখা, ইহার অর্থ নিরর্থকতাকে দেখা। মানুষ ইচ্ছা করিল, কাজ করিল, সুখ দুঃখ ভোগ করিল, তাহার পর মরিয়া গেল। সেইখানে মৃত্যুকে যখন দেখি তখন মানুষের জীবনের সমস্ত ইচ্ছা সমস্ত কাজের অর্থকে আর দেখতিে পাই না। তাহার দীর্ঘকালের জীবন মুহূর্তকালে মৃত্যুর মধ্যে হঠাৎ মিথ্যা হইয়া গেল।

পদে পদে এই মৃত্যুকে দেখা, এই অর্থহীনতাকে দেখা তো কখনোই সত্য দেখা নহে। অর্থাৎ ইহা কেবল বাহিরের দেখা; ভিতরের দেখা নহে; ইহাই যদি সত্য হইত তবে মিথ্যাই সত্য হইত--তাহা কখনোই সম্ভব হইতে পারে না। জীবনের কার্য ও বিশ্বের ব্যাপ্তির মধ্যে একটি পরমার্থকে দেখিতেই হইবে। মুখে যতই বলি না কেন, কোনো অর্থ নাই; যতই বলি না কাজ কেবল কাজকে জন্ম দিয়াই চলিয়াছে তাহার কোনো পরিণাম নাই, ব্যাপ্তি কেবলই দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সঙ্গে দেশকালাতীত সুগভীর পরিসমাপ্তির কোনোই যোগ নাই--মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিতে পারে না।...

ধর্মের নবযুগ

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোটো ছোটো সীমার মধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। এমন অবস্থায় মানুষ স্বার্থপরভাবে কাজ করে, গ্রাম্যভাবে চিন্তা করে, ও সংকীর্ণ সংস্কারের অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত অনুদারভাবে নিজের রাগ দ্বেষকে প্রচার করে। এইজন্যই দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়াও নিজেকে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অন্তত

একবার করিয়াও একথা বুঝিতে হইবে যে কোনো ভৌগলিক ভূমিখণ্ডেই আমার চিরকালের দেশ নহে, সমস্ত ভূর্ভূবঃ স্বঃ আমার বিরাট আশ্রয়; অন্তত একবার করিয়াও অন্তরের মধ্যে এই কথাটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হইবে যে, আমার ধীশক্তি আমার চৈতন্য কোনো একটা কলের জিনিসের মতো আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বদ্ধ নহে, জগদ্ব্যাপী ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমুহূর্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে।

এইরূপে নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্মকেও যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলই তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্মসম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আমাদের ধর্ম, আমাদের আত্মাভিমান বা দলীয় অভিমানের উপলক্ষ্য হইয়া পড়ে; ভেদবুদ্ধি নানা প্রকার ছদ্মবেশ ধরিয়া জাগিতে থাকে; এবং আমরা নিজের ধর্মকে লইয়া অন্যান্য দলের সহিত প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় হারজিতের ঘোড়দৌড় খেলিয়া থাকি। এই সমস্ত ক্ষুদ্রতা যে আমাদেরই স্বভাব, তাহা যে আমাদের ধর্মের স্বভাব নহে সে কথা আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাই এবং একদিন আমাদের ধর্মের উপরেই আমাদের নিজের সংকীর্ণতা আরোপ করিয়া তাহাই লইয়া গৌরব করিতে লজ্জা বোধ করি না।

এইজন্যই আমাদের ধর্মকে অন্তত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেস্টন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার নিত্য প্রতিষ্ঠায় তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোথাও তাহার বাধা আছে কিনা--বুঝিতে হইবে তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।

কিছুকাল হইতে মানুষের সভ্যতার মধ্যে একটা খুব বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিতেছে--তাহার মধ্যে সমুদ্র হইতে যেন একটা জোয়ার আসিয়াছে। একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। নিজের সঙ্গে সমস্থ মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে জানার ভিতর দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিয়া জানা যায় এ কথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চৌকিতে খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি--অন্য জাতি, ধর্ম সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না। স্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা অটল অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।

ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং--এষোস্য পরম আনন্দঃ--ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ব্রহ্মজ্ঞানকে তো আমরা ধর্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না--ব্রহ্মজ্ঞানী তো ব্রহ্মের ভক্ত নহেন। রস ছাড়া তো আর কিছুই মিলাইতে পারে না ভক্তি ছাড়া তো আর কিছুই বাঁধিতে পারে না। জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের এক তারের সঙ্গে আর এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না--মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটে না।

ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা যেমন বিশ্ব সত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি যে রস স্বরূপ তাহা কেবল মাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই।

কোনো বাহ্যমূর্তিতে নহে, কোনো ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে--একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখণ্ড কারিয়া অসন্দিদ্ধ করিয়া দেখিতেছি।

বস্তুত পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সঙ্গেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য; সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিল। আর সর্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের আচার-বিচার অনুষ্ঠান কল্পনাকাহিনীকে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই; কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে--সেইখানেই যখন পরতামত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকূল-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি না।

(সংকলিত)

বামাখ্যাপা ও আগন্তুক

কেশব সেন

'শ্যামা ধন কি সবাই পায়?' এই প্রশ্ন তো সব সাধকেরই। শক্তিরঙ্গ বঙ্গদেশ শ্যামা সাধনার এক পুণ্য ক্ষেত্র। এমনটাই বিশ্বাস করেন ভারতব্যাপী শক্তি সাধকরা। আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, এই ভূমি তে বহু সাধকই কালী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের আরাধ্যার দেখাও পেয়েছিলেন। রামপ্রসাদ সেন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, সর্বানন্দ দেব থেকে বামাখ্যাপা এই অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। জনশ্রুতি অনুযায়ী, এঁদের প্রত্যকের জীবনেই রয়েছে অগণিত অলৌকিক ঘটনা। বাংলার এই কালী সাধকদের মধ্যে তিন জনের দেহত্যাগের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অতিলৌকিক কাহিনি। এঁরা যথাক্রমে রামপ্রসাদ সেন, কমলা কান্ত ভট্টাচার্য এবং

বামা চরণ চট্টোপাধ্যায় বা বামা খ্যাপা। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জন্ম আনুমানিক ১৭১৮ থেকে ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। তাঁর প্রয়াণ আনুমানিক ১৭৭৫ সালে। রামপ্রসাদের জীবনে অতিলৌকিক ঘটনার বহু উদাহরণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল, তাঁর বেড়া বাঁধার কাহিনি। যেখানে স্বয়ং জগদীশ্বরী তাঁর কন্যা রূপে দেখা দিয়ে তাঁকে বেড়া বাঁধতে সাহায্য করেন। কবিরঞ্জন তাঁর গানে ও এই কাহিনির উল্লেখ করেছেন।

রামপ্রসাদের জীবনের অন্তিম লগ্নও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। রামপ্রসাদের অন্যতম জীবনীকার দয়ালচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'প্রসাদ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সেই ঘটনার। দয়ালচন্দ্রের মতে, রামপ্রসাদ বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ঐহিক লীলাশেষ হয়ে এসেছে। জীবনান্তের পূর্ব লক্ষণ বুঝতে পেরে তিনি বিশেষ পূজা করেন তাঁর আরাধ্যার। মৃন্ময়ীর মূর্তি বিসর্জনের কালে তিনি তাঁর নিজের লেখা গান গাইতে গাইতে হালিশহরের ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হন। গঙ্গায় অর্ধ নাভি নিমজ্জিত রেখে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। কথিত আছে প্রয়াণ-মুহূর্তে তিনি যে পদটি উচ্চারণ করছিলেন, সেটি এই 'মা গো, ও মা আমার দফা হল রফা, দক্ষিণা হয়েছে'। দয়ালচন্দ্রের মতে কবিরঞ্জনের মৃত্যু রোগে হয়নি। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল 'ভাব'-এ।

বর্ধমানের মাতৃসাধক কমলা কান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। কমলা কান্ত বর্ধমান রাজ তেজচন্দ্রের গুরু এবং সভাকবি ছিলেন। তেজচন্দ্র বর্ধমানের কোটাল হাটে কমলা কান্তের জন্য কালী মন্দির তৈরি করে দেন। রাজা তেজচন্দ্র বেশ কয়েক বার কমলাকান্তের ঐশী শক্তির পরীক্ষা নিয়েছিলেন। কথিত আছে, এই সব পরীক্ষা তিনি তাঁর এক মন্ত্রী বা দেওয়ানের পরামর্শেই নিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই দেওয়ান রাজসভায় কমলাকান্তের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়েই না কি রাজাকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকেন।

তেজচন্দ্রের অনুরোধে কমলাকান্ত তাঁকে অমাবস্যা তিথিতে পূর্ণ চন্দ্রদর্শন করিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। তবে তন্ত্রমার্গে 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' এক প্রতীকী ব্যঞ্জনাও বহন করে। তা এক বিশেষ উপলব্ধির কথা বলে। এমনও হতে পারে, তন্ত্রাভিলাষী রাজাকে তাঁর গুরু হিসেবে কমলা কান্ত হয়তো সেই উপলব্ধির স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই দেওয়ানের পরামর্শে রাজা কমলাকান্তকে নির্দেশ দেন, মা কালী মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর সেই মূর্তি সত্যিই জীবন্ত কিনা তার প্রমাণ দিতে হবে। রাজা কে কমলাকান্ত জানান, এতে ঘোরতর অমঙ্গল ঘটবে। কিন্তু রাজা তাঁর আদেশ কিছুতেই ফিরিয়ে না নিলে বাধ্য হয়ে কমলাকান্ত মায়ের মূর্তির পায়ে বেল গাছের কাঁটা বিঁধিয়ে রক্তপাত ঘটান।

কমলাকান্ত ভাবতে শুরু করেন, এই ঘটনার ফলে তিনি সাধনভ্রষ্ট হয়েছেন। মায়ের অপার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ক্রমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৮২০ বা মতান্তরে ১৮২১ সাল নাগাদ তাঁর দেহান্তর হয়। দেহ ত্যাগ কালে কমলাকান্ত চেয়েছিলেন তাঁর গঙ্গা প্রাপ্তি ঘটুক। কিন্তু বর্ধমানের যে গ্রামে তিনি দেহ রাখেন, তার ধারে কাছেও গঙ্গা ছিল না। সাধকের অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করতেই যেন তাঁর আরাধ্যা সক্রিয় হন। তাঁর সেই মন্দির প্রাঙ্গণের মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে গঙ্গার জল। পরবর্তী কালে সেই স্থানে একটি কুয়ো তৈরি করে দেওয়া হয়। সেই কুয়োর জলে আজও কালী পূজার সময়ে দেবীর ভোগ রান্না করা হয়।

বাংলার শক্তি সাধনার পরম্পরায় বামা চরণ চট্টোপাধ্যায় বা বামা খ্যাপা এক আশ্চর্য চরিত্র। সহস্র বছরের ও বেশি প্রাচীন শক্তি ক্ষেত্র তারাপীঠের কাছে আটলা গ্রামে বামা চরণ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৭ সালে। তারা সাধক বামাচরণ তন্ত্রধর্মে বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত বশিষ্ঠ ধারার সাধক ছিলেন। সারাজীবন ধরে অজস্র অতিলৌকিক ঘটনার কেন্দ্রে রয়েছেন বামদেব। ১৯১১ সালে এই সাধকের প্রয়াণ ঘটে। তাঁর প্রয়াণকে ঘিরে রয়েছে এক রোমাঞ্চকর ঘটনা।

বামদেবের মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯১১ সালের ১৮ জুলাই। তিনি সে সময় পুরোপুরি শ্মশানবাসী। প্রয়াণের কয়েক দিন আগে

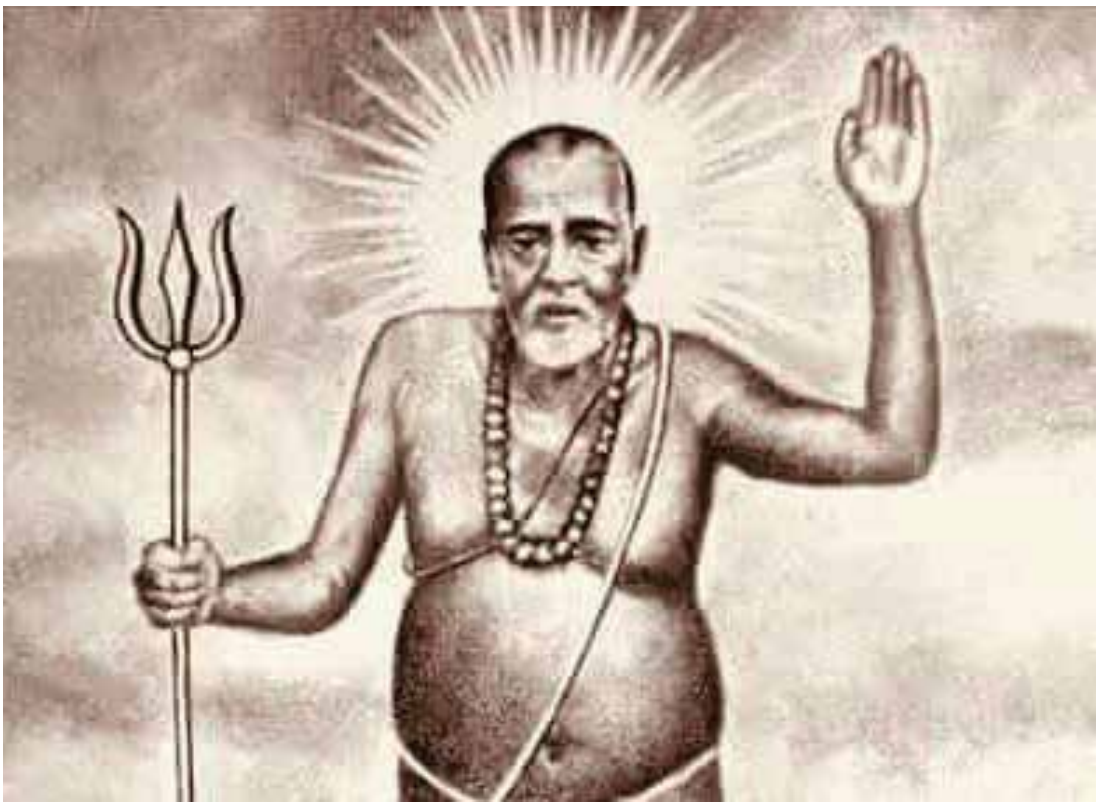

এক ঘোর বর্ষার সন্ধ্যায় তারাপীঠের সেই মহাশ্মশানে না কি আবির্ভাব ঘটে এক আশ্চর্য পুরুষের। তিনি ঘোর কৃষ্ণকায়, দীর্ঘকায় ও শীর্ণ। তাঁর মাথায় অবিন্যস্ত কেশ, চোখ বর্তুলাকার ও রক্তাভ। এই ব্যক্তি শ্মশানে বাস করতে শুরু করলেন। তিনি গলিত শবের মাংস আহার করেন। যা দেখে বামদেবের ভক্তকুল রীতি মতো ভয় পেয়ে গেলেন।

একদিন বামদেব তাঁর আসন শিমুলতলায় বসে আছেন, সেই সময় সেই লোকটি শব-মাংস ভক্ষণ করতে করতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বামদেব তাঁকে দেখে গালিগালাজ করতে লাগলেন। তিনি ও পাল্টা গালি গালাজ করলেন। এরপর থেকেই বামদেব খানিক নিরাসক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর বারবার সমাধি হতে লাগল। কথা বার্তা ও কমে এল। সেই আগন্তুক কিন্তু রোজই হানা দিতে থাকলেন বামদেবের আসনের কাছে। তাঁর অট্টহাসিতে কেঁপে উঠতে শুরু করত শ্মশান। একদিন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সেই আগন্তুক বামদেবের কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বামদেবের সঙ্গে অনেক তখন শিষ্য উপস্থিত। কিন্তু তিনি সকলকে উপেক্ষা করে বামদেবের উদ্দেশে বলে উঠলেন, "আর কেন?" বামদেবও গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে উত্তরে বললেন, "হুঁ।" বাবার শিষ্য নগেন্দ্রনাথ বাগচি সেই আগন্তুককে তখনকার মতো তাড়িয়ে দিলেন।

পরদিন বামদেব নগেন্দ্রনাথকে শ্মশানের এক বিশেষস্থান দেখিয়ে সেখানে তাঁর অন্তিম সংস্কার করার নির্দেশ দিলেন। তারপর সমাধিস্থ হলেন। সন্ধ্যের দিকে তাঁর সমাধি ভঙ্গ হল। তিনি তারা নাম করে আবার সমাধিস্থ হলেন। ক্রমে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে লাগল। শিষ্যরা কবিরাজ ডাকতে রামপুরহাট গেলেন। এমন সময়ে সেই আগন্তুক আবার এসে দাঁড়ালেন সেখানে। তিনি জানালেন, বামদেব সব চিকিৎসার উর্ধ্বে চলে গিয়েছেন। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে তিনি নিরাকারে বিলীন হয়েছেন।

এরপর বামদেবের অন্তিম সংস্কারের বন্দোবস্ত শুরু হল। সংস্কারের স্থান নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে মতান্তর দেখা দিলে সেই আগন্তুক সেখানে আবির্ভূত হয়ে এক বিশেষ স্থান দেখিয়ে দিলেন। বামদেবের সমাধি কার্য যতক্ষণ চলছিল, ততক্ষণ সেই আগন্তুক সেখানে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন। সমাধিকার্য শেষ হতেই তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে বামদেবকে প্রণাম করে প্রবল অট্টহাস্য করতে করতে শ্মশান সংলগ্ন অরণ্যে প্রবেশ করলেন। আর কোনওদিন তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়নি। কে ছিলেন সেই আগন্তুক? তন্ত্রজ্ঞরা বলেন, তিনি কালভৈরব। তিনি স্বয়ং শিবের এক রুদ্র রূপ। বামদেবও তাঁর ভক্তদের কাছে 'ভৈরব' হিসেবে পূজিত হন আজও। তা হলে কি স্বয়ং মহাকালই এসেছিলেন তাঁর একান্ত ভক্তকে নিয়ে যেতে? প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন এর উত্তর।

সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা

জগদ্ধাত্রী

কামরান চৌধুরী

পার্বতীর উগ্ররূপে তুমি নারায়ণী যোগমায়া মহামায়া
তুমি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী, অন্তর মাঝে নিত্য তোমার ছায়া।
মা জগত্তারিণী ছিন্নমস্তা জগদ্ধাত্রী ত্রৈলোক্যজননী
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহাদেব সহ দেবাদিদেবের তেজে জন্ম... দেবী কাত্যায়নী।
অসুরমর্দিণী মা আমার, ধরার অসুর করো নাশ
তুমি মানবের-ধরণীর শত্রুর গলায় দাও ফাঁস;
অবিচার অনায্যতায় যে, জীবনে নিয়ত হাসফাঁস
জগদ্ধাত্রী তুমি দুষ্কর্মের রশিতে মা... টেনে ধরো রাশ।
রক্ষাকারী- রক্ষা করো তুমি, দুর্গতিনাশিনী সর্বরূপিনী মা ত্রিনয়নী,
ত্রিলোকের জ্ঞান দাও ঢেলে, মঙ্গল প্রদীপ অন্তরে অন্তরে।

সুস্থতা দাও, পূর্ণতা দাও, দাও ভক্তি প্রেম ভালোবাসা
শক্তি আলোয় জাগিয়ে দাও প্রতিবাদে প্রতিকারে সর্বত্র রাঙিয়ে যাও।
অন্তরের মাঝে জেগে রও নিত্য-অনিত্যের খেলা খেলে
আশ্রয়, প্রশ্রয়, কি শান্তনা, ডুব দিয়ে যাও অবহেলে।
মুছে দাও সব পাপ-তাপ, রোগ-শোক বিপদ আপদ
শুদ্ধ ঋদ্ধ রাখবো জীবন, তব সম্মুখে নিই শপথ।
তোমাকে দেখলে শান্ত হৃদয়... অশান্তিরা প্রশমিত হয়।
জগতের যত পুণ্য ধাম, তার চেয়েও শান্তি তোমার সম্মুখে পাই
আগলে রেখো মা সযতনে, একুল-ওকুলে দিও ঠাই।

তোমার স্পর্শ, দর্শন-চিন্তা, জাগায় মনে অমিত শক্তি
শতত আকাশ জোড়া ভক্তি, সর্বত্র সে... কি...! মিলন মুক্তি।
মুখ হাসিতে ছড়ানো দ্যুতি, চোখ গভীরে অনন্ত জ্যোতি
তোমার সম্মুখে নত দেহ, প্রণামী মন্ত্রে সুরক্ষা গেহ।
তোমার থেকে এই জীবন, পেয়েছে নমনীয়তা
তোমার থেকে পেয়েছি যেন তেজ তেজঃস্বীতা।
এক চোখে ঝরে পড়ে স্নেহ-প্রেম-দয়া মায়া
অন্য চোখে রুদ্র অগ্নি রোষ, রণাঙ্গনে শত্রু বধে ব্যস্ত কায়া।
তোমার আরাধনায় জাগি আমি, জাগো তুমি, জাগে এ বিশ্ব আলয়
জগতের মায়া ভুলে ভুলে কখন যে হই নিঃস্ব; উন্মুক্ত বলয়।।

অর্থহীন জীবন

অশোক ধর

নরকের নিকৃষ্টে
কুণ্ডলীর মধ্যে
বসে আমি
খুজে নিয়েছি
আমার পাপকে
খুজে পাই
মিথ্যা বলা মহাপাপ
গুম, খুন, ধর্ষণ রাহাযানি,
সবকিছুই মহাপাপ, মহাঅপরাধ
মানবিক কাজ না করলে
মানুষ রুপি জানোয়ার তারা
মানুষ রুপে জন্মে
সত্য ন্যায়নীতি কল্যানের
পথে না থাকলে
মানব জন্ম সিদ্ধ নয়
যেন এক অর্থহীন জীবন।

তোমাকে পুঁজিবে

অশোক ধর

তোমাকে পুঁজিবে সবে
যদি তুমি থাক
সৎ ও ন্যায়ের পথে
তোমাকে স্মরিবে ভবে্
তুমি যদি হও
সত্য ও সুন্দরের পথে
তুমি মরেও অমর হবে
যদি তুমি কিছু করে থাক
জগতের মাটি ও জীবের কল্যাণে

আমরা মধ্যবিত্ত

আরতি দাশ পোদ্দার

অভিশাপে নাকি গরীব জন্ম আর্শীবাদে ধনী,
মধ্যবিত্তকে জীবন ভর থাকতেই হয় ঋনী।
সুদিন আসুক কিংবা দুর্দিন চিত্রটা একই থাকে,
বুক ফাঁটে তো মুখ ফোঁটেনা সম্মান বোধে লাগে।
গরীবের তবু সরকার আছে, আরো আছে ভিনদেশ
সরকারি ও সেবা দাতাদের দানে, কেটে যাবে কয় মাস।
ওদের বিনে পয়সায় চাল আলু মেলে, সাথে রান্নার গ্যাস
বাকি প্রয়োজন মিটানোর তরে ব্যাংকে মিলছে ক্যাশ।
ওরা কর্মবিহীন, অর্থবিহীন, দুহাত পেতে নিতে
শিক্ষার ঝুলি শুন্য ওদের, লাগেনা সম্মানেতে
ধনীর আছে অগাদ অর্থ খাদ্যের উদ্ববিত্ত,
অভাবের জালে হাসফাঁস প্রাণ, কাঁদে মধ্যবিত্ত।
ওদের নেই সরকারি দান, কিংবা দ্রব্য অল্প মূল্যে
ধনীর দামেই কিনতে হচ্ছে, টান পড়ছে সাকুল্যে।
কবি একা কাঁদে শুকনো পেটে, কাঁদে কলমের ডগায়।
বাঁচিক শিল্পী পেটে গিট বেঁধে, একা কবিতাটা আওরায়।
গৃহ শিক্ষক বেতন বিহীন পারে নাকো যেতে পড়াতে,
নির্ভাক স্ত্রী চেয়ে থাকে শুধু, শুন্য চালের হাঁড়িতে।
শিল্পীর তুলি একা কেন ফাছি, রং এর মূল্য ভারি
ক্ষুধার্ত ছবি পড়ে এক কোনে, কে দেবে মূল্য তারই।
মৃত্যুর ভয় পথছাড়া সব, সব জমায়েত বন্ধ
শ্রোতাধর শোকে অভাবি শিল্পী, সুরেরা হয়েছে অন্ধ।
তবলচি ঘরে একা তবলায়, কেটে যায় সুরতাল
মনে হাহাকার কি হবে কালকে ফুরিয়ে যাচ্ছে চাল।
বিদ্যার ধনে যত হও ধনী, যদি না থাকে অর্থ
মধ্যবিত্তের তকমা জড়িয়ে জীবনটাই হবে ব্যর্থ।

দুর্গা

সুর্বণা দে

দুর্গা তুমি কন্যা
বড়ই মিষ্টি আদুরে।
দুর্গা তুমি বোন
বড়ই যত্নবান স্নেহভরা।
দুর্গা তুমি প্রেমিকা
শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ভালোবাসা
দুর্গা তুমি স্ত্রী
পরম প্রিয়তমা, অর্ধাঙ্গীনি।
দুর্গা তুমি মা
জগত জননী, মমতাময়ী।
দুর্গা তুমি সকল শক্তির উৎস
কারণ তুমি নারী, মহীয়সী।
তবে প্রশ্ন জাগে মনে
কেনো তুমি আজ অবহেলিত।
তবে ঘরের লক্ষী, সরস্বতী
তবে এতো কিছুর পরেও,
কেনো পরের ঘরে তুমি আশ্রিত।
কেনো মা? কেনো?

শিক্ষকের মর্যাদা

অনন্যা রায়

শিক্ষা ছাড়া কেউ কোনো দিন
হয়নি মহিমান্বিত।
শিক্ষাই করে জাতি ধর্মের
সকলকে গৌরবান্বিত।
আঁধার রাতে যেমনি ভাবে
অন্ধরাতে গ্রাস করে
শিক্ষা ছাড়াও মনের ঘরে
পশু এসে বাস গড়ে।
শিক্ষা যে দেয় শিক্ষকেরা
মানুষ গড়ার কারিগর।
বিবেক করে জাগ্রত আর-
আলো করে মনের ঘর।
শিক্ষা গুরুর নাই তুলনা
উড়ায় জ্ঞানের ফানুস
তার দেখানো পথ মাড়িয়েই
হই আমরা মানুষ।
শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড
শিক্ষক হলো শক্তি
তাই শিক্ষকের তরে রইল
অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

আমাদের জন্য তিনি

অন্যন্যা রায় তমা

আমরা গাইবো মণপ্রাণ খুলে নতুন সুরের গান
আমরা লিখবো নতুন ভাষায় কবিতা ও অভিধান,
আমরা খেলবো, ঘুরবো-উড়বো চড়ে বাতাসের রেলে
আমরা নাচবো ময়ুরের মতো মনের পেখম মেলে
আমরা নাইবো, নাওটি বাইবো কাঁপিয়ে নদীর কূল
আমরা ফুটবো বাগানে যেমন ফুটে উঠে সব ফুল
স্বপ্নের রঙে রাঙিয়ে রাঙিয়ে আমরা আঁকবো ছবি
কেউ ডাক্তার- বিজ্ঞানী হবো কেউবা শিল্পী কবি।
আমাদের এই পথ চলা যেন হয় ভয় বাঁধাহীন
কারো কাছে যেন না থাকি আমরা পদানত পরাধীন
সেই সংগ্রাম করে অবিরাম গিয়েছেন একজন
আমাদের কথা ভেবে করেছেন নিজের জীবন পণ
তিনি আমাদের প্রিয় নেতা শেখ মজিবুর রহমান
আমরা গাইবো, কেবলই গাইবো তাঁর জয় গুণগান
তাঁর জন্যই আজকে আমরা মাথা উচু করে চলি
তাঁর জন্যই আজকে আমরা বাংলায় কথা বলি,
তাঁর জন্যই আমরা স্বাধীন এ দেশের নাগরিক
তাঁর জন্যই আজ আমাদের অবারিত দশদিক,
তাঁর জন্যই হাজার যুগের আঁধার পেরিয়ে আসা
তাঁর জন্যই ঝলমলে এই আলোর জোয়ারে ভাসা,
তাঁর জন্যই আমরা এভাবে নিজেদের চিনলাম
তাঁর জন্যই পেলাম বাঙালি পরিচয় আর নাম
তাঁর জন্যই পেয়েছি পতাকা সবুজে সূর্য আঁকা
আর এই মানচিত্র পেয়েছি ছায়াপ্রীতি মায়া মাখা
পেয়েছি জাতীয় সঙ্গীত সুমধুর মোহনীয়
আমার সোনার বাংলা গান যে আমাদের বড় প্রিয়
আমরা সকলে মিলে যতবার যখনি গাই এ গান
শুনি যেন ঠিক জাতির পিতার উদাত্ত আহবান
বলো এক সাথে হাত রেখে হাত বাংলাকে ভালোবাসি
ভয় নাই আমি আছি তোমাদের কাছাকাছি পাশাপাশি
তাঁর এই বাণী শুনি আর মানি, পথ চলি প্রতিদিন
তিনি আমাদের স্মৃতিতে আছেন জাগরুক অমলিন
তিনি থাকবেন তাঁর অবদান অক্ষয় অম্লান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বিশ্বময়ী

লক্ষ্মী রানী বণিক

শরতের শিউলি ঝরা নির্মল প্রভাতে,
অসুর বিনাশিনী মা দুর্গা এলেন ধরাতে।
মৃন্ময়ীর মাঝে করি চিন্ময়ীর সাধনা,
তব কৃপায় দূর হোক সকল অনর্থ উন্মাদনা।
জগতের মঙ্গল দীপ নিভে অশুভ নিঃশ্বাসে,
আসুরিক বিকৃত শক্তি মৌলিক বিশ্বাসে।
অশুভ শক্তির কালো ছায়া ঘিরিছে দেশ-সমাজ,
ভূ-লুণ্ঠিত তাই বুঝি কল্যাণ কামনা আজ।
ষড়রিপুর উদ্ধত বিলাস মানবতার পরম শত্রু,
এদেরই রাজত্ব আজ, শুভ চেতনার অপমৃত্যু।
একদা তোমার মহাবিজয়ে পৃথিবী হয়েছিল কণ্টক মুক্ত,
শুভ শক্তি আজ পরাজিত, অশুভের আধিপত্য।
কালো হাত শুভ্র হোক ওগো কল্যাণময়ী,
তব আগমনে ধন্য হোক বিশ্ব, ওগো বিশ্বময়ী।

Together we progress

"With Best Wishes"

Wishing all, Good Health, Happiness, Prosperity and much more .

Have a joyous Durga Puja .

IICCI Bangladesh Limited
House # 2/A, Road # 08,
Baridhara Diplomatic Zone, Dhaka- 1212
Mobile: +88-01716130636
Phone: +88-02-9861100, +88-02-84410409
Email: marketing.iicci@gmail.com , iicci.2016@gmail.com
Website: www.iiccibdltd.com

Indian Importers Chambers of Commerce & Industry (IICCI)
F- 5, Hauz Khas Enclavc, New Delhi-110016 (India)
Tel: +91-11-26963660 / 41655142 /40593983
E-mail: iicci@indianimporterschambers.com , admin@indianimporterschambers.com
Web-site: www.indianimporterschambers.com

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
পিএবিএক্স: ৯১০৩৯৬০-৬৯

জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র: ৯৫৬৩৬৬৭-৬৮, ৫৫০৪৫১১৩-১৪
www.titasgas.org.bd

গ্যাস অপচয় রোধে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ঃ

- নাগরিক জীবনে প্রাকৃতিক গ্যাসবিহীন একদিনের মথা কি ভাবা যায়?
- অথচ এই মূল্যবান গ্যাস প্রতিনিয়তই আমরা অবহেলা এবং অসচেতনতায় অপচয় করছি।
- প্রয়োজন ছাড়া চুলা জ্বালিয়ে রেখে গ্যাস অপচয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎকে সংকটাপন্ন করছি।
- সার্বক্ষণিক চুলা জ্বালিয়ে রাখার কারণে অগ্নিকাণ্ডের মতো বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনছি।
- বাসা-বাড়িতে/আবদ্ধ এলাকায় প্রথম অবস্থাতেই গ্যাসের চুলা না জ্বালিয়ে আবদ্ধ স্থানের স্বাভাবিক বায়ু চলাচলের পথ খুলে দিয়ে কিছুসময় অপেক্ষা করে চুলা জ্বালাতে হবে।
- রান্না শেষে গ্যাসের চুলা নিভিয়ে ফেলুন। চুলার নবটি ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হোন।
- প্রাকৃতিক গ্যাস যথাযথভাবে ব্যবহার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।
- গ্যাস অপচয় রোধ করে এই সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন।
- আপনার সচেতনতাই পারে গ্যাস অপচয় রোধ করতে।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত সীমিত, অফুরন্ত নয়।
- চাহিদা মেটাতে প্রাকৃতিক গ্যাস বিদেশ থেকে

তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ

Heartiest wishes in the event of Durga Puja

With the best compliments from

mainstream
SHIPPING & LOGISTICS LTD.
International Freight Forwarder & Logistics Service provider
www.mainstream-bd.com

Corporate Office: House # 288 (3rd Floor), Road # 19/C, New DOHS, Mohakhali
Dhaka-1206, Bangladesh, Tel: +880 2 9859526, 8711714, Fax: +880 2 8711715
Branch Office: 11, Sk. Mujib Road, Chaity Plaza (4th Fl.), Agrabad C/A, Chittagong, Bangladesh
Email: keshab@mainstream-bd.com

Registered Office: 49, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh

Heartiest wishes in the event of Durga Puja

With the best compliments from

Bushra international
Bushrainternational
Importer and Govt. Supplier
www.bushraintl.com

Corporate Office: House # 288 (2nd Floor), Road # 19/C, New DOHS, Mohakhali
Dhaka-1206, Bangladesh, Tel: +880 2 9859526, 8711714, Fax: +880 2 8711715
E-mail: info@bushraintl.com

Registered Office: 49, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh

"অপরাজিতা"-র বিগত সংখ্যার প্রচ্ছদসমূহ

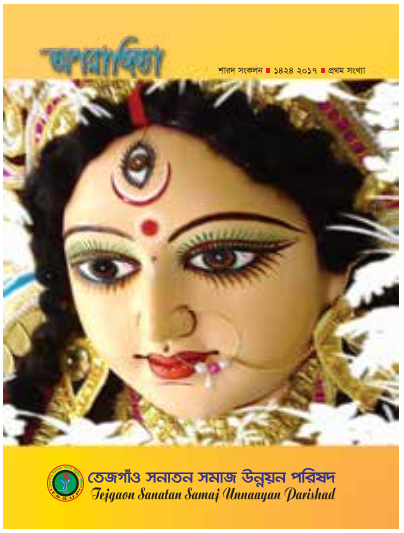

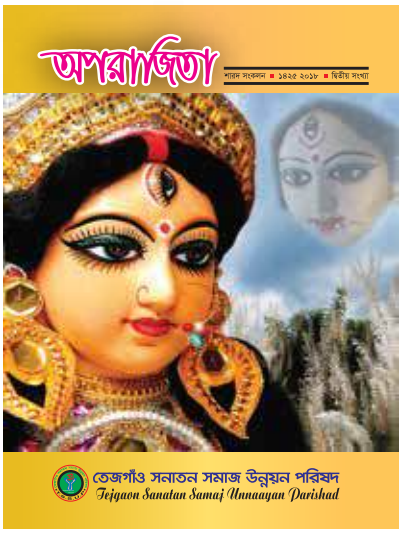

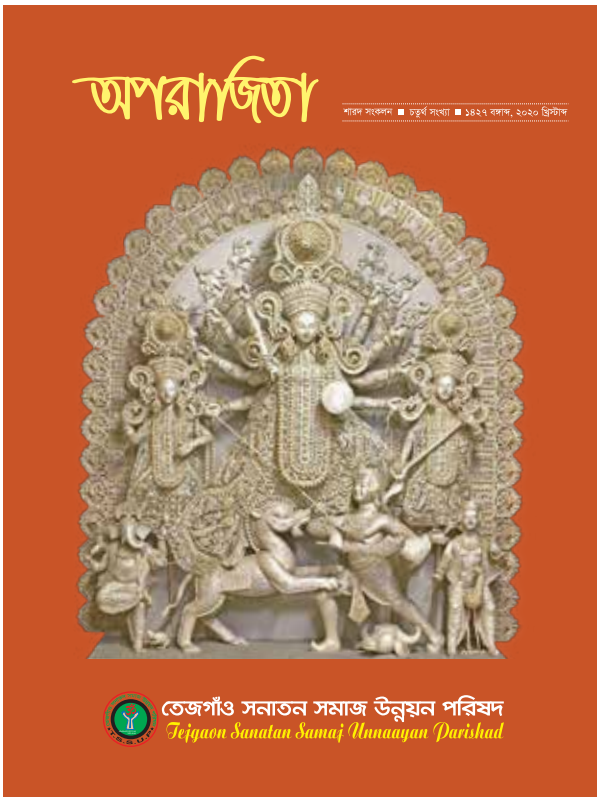

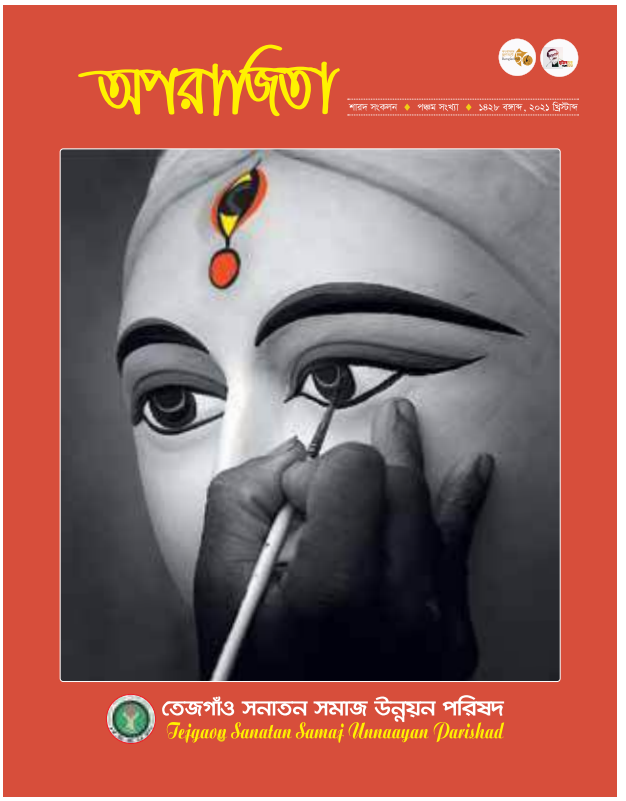

RUNNER
motorcycles

জন্ম থেকেই বাংলাদেশী

AWARDED Superbrands BANGLADESH'S CHOICE 2020-21

রানার পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে-

শারদীয় শুভেচ্ছা

6 YEARS WARRANTY

১ লাখ টাকা পর্যন্ত ইন্সুরেন্স

৯টি ফ্রী সার্ভিস ও ২৪ মাস পর্যন্ত সহজ কিস্তি সুবিধা

RunnerMotorcycles

www.runnerautomobiles.com

16273

আলোকচিত্রে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

আলোকচিত্রে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

আলোকচিত্রে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

আলোকচিত্রে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

আলোকচিত্রে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

আলোকচিত্রে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

আলোকচিত্রে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

আলোকচিত্রে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

আলোকচিত্রে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

আলোকচিত্রে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

আলোকচিত্রে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন

সনাতন ধর্মে বর্ণ ও শ্রাদ্ধ

বাদল চন্দ্র রাজবংশী *এফসিএ*

সনাতন ধর্মে বর্ণ ও শ্রাদ্ধ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সকলের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এটা ধারণা করা যায় এবং এটা অনুমেয় যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ এবং দ্বাপরযুগ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানব জাতির বর্ণ পরিচয় বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হতো।

যাঁরা ব্রাহ্মণ বর্ণের ছিলেন তাঁদের সন্তাগনও দ্বিজ হয়ে ব্রাহ্মণই হতেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবতগীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৪২নং শ্লোক-এ ভগবান নির্ধারিত নবগুণ অর্থাৎ শম, দম, তপস্যা, শৌচ, কৃষ্ণা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য বিদ্যমান থাকতো, তাঁদের মধ্যে উক্ত নবগুণের প্রকাশ ছিল এবং তাঁরা নির্দ্বিধায় ব্রাহ্মণ বলেই গৃহীত এবং গন্য হতেন-কোন সন্দেহ নেই।

অপরদিকে যারা শৌর্য, তেজ, ধৃতি, রাজ্য শাসনের দক্ষতা, যুদ্ধ-বিদ্যা অধ্যয়ন করে পারদর্শী হতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণভয়ে পলায়ন করতেন না, যারা দান ধ্যান করতেন এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বজায় রাখতেন তাঁরা ক্ষত্রিয় বলে গন্য হতেন এবং তাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে এই পেশায়ই নিয়োজিত থাকতেন (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮শ অধ্যায় শ্লোক নং ৪৩)।

অপর একটি শ্রেণি যারা ব্যবসা বাণিজ্য, গো-পালন এবং জমি চাষ করতেন তাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে এই কাজেই নিয়োজিত থাকতেন বিধায় তারা বৈশ্য বর্ণের অধিকারী হতেন (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮শ অধ্যায় শ্লোক নং ৪৪)।

আর একটা শ্রেণির মানুষ যাদের নিজস্ব কোন সহায় সম্বল ছিলো না, তারা অনন্যোপায় হয়ে জীবন ধারণের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী বা করুণার পাত্র হয়ে থাকতো অর্থাৎ যাদের সহায় সম্পত্তি ছিল এমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যর কাছে গিয়ে তাদের কথামতো বা ফরমায়েশ মত কাজ বা সেবাদান করে তারা নিজের এবং পরিবারের অন্ন যোগাড় করতো। তাই তারা ছিলেন শূদ্র বর্ণের (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮শ অধ্যায় শ্লোক নং ৪৪)।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।।
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮শ অধ্যায় শ্লোক নং ৪১)

অর্থাৎ হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্মসকল পূর্ব-জন্মের সংস্কার-জাত গুণদ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত। অর্থাৎ তিনি যে গুণ-প্রধান, তিনি সেই শ্রেণীর কার্যে বিভক্ত হন, অতএব গুণানুসারেই বর্ণের সৃষ্টি, স্বত্ব-প্রধান যিনি তিনি ব্রাহ্মণ, স্বত্ব-রজঃ-প্রধান ক্ষত্রিয়, রজস্তমঃ-প্রধান বৈশ্য আর তমঃ-প্রধান হচ্ছে শূদ্র। তিনি যে যে গুণে প্রধান থাকেন তিনি সেই সেই বর্ণ শ্রেণী প্রাপ্ত হন।

তবে যে কোন মনুষ্য তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও একনিষ্ঠ সাধনার মাধ্যমে কর্ম ক্ষেত্রে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করতে করতে তার জন্মসূত্রে অর্থাৎ পূর্ব জন্মের কর্মফলের মাধ্যমে প্রাপ্ত বর্ণ থেকে অধিকতর উন্নত বর্ণ পরিচয় লাভ করে। অর্থাৎ তখন গুণানুসারে বর্ণের সৃষ্টি তখন সদগুরুপদিষ্ট মার্গে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারেন।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯ম অধ্যায়, শ্লোক নং ৩০)।
"অপি চেৎ সুদূরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সঃ।।" ৯/৩০

যদি অত্যন্ত দূরাচার ব্যক্তি (যেমন রত্নাকর দস্যু) অনন্য ভজনশীল হয়ে (অন্য দেবতাও বাসুদেব, এই মনে করে অন্যভাবে দেবতান্তরে ভক্তি না করে) আমাকে ভজনা করেন, তিনিও সাধু বলে গণ্য, যেহেতু তিনি উত্তম অধ্যবসায় করেছেন।

সনাতন মানব সমাজে বাহ্যিক গুণ বিচারে দৃশ্যমান চারটি বর্ণ যথাক্রমেঃ

১. ব্রাহ্মণ; ২. ক্ষত্রিয়; ৩. বৈশ্য এবং ৪. শূদ্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক নং ১৩:

তবে এর বাইরেও আরো অনেক নিম্ন মানের বা শ্রেণির মানুষ ছিলেন যারা কোন বর্ণে স্থান পাননি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদভগবদ্গীতায় প্রকৃতির তিনটি গুণের সাথে কর্মের সংমিশ্রনে চারটি বর্ণের কথা বলেছেন। যেখানে বর্ণ জন্ম সূত্রে পাওয়া বা বংশপরম্পরায় পাওয়া পৈত্রিক সম্পত্তি নয়।

১. যে মানুষের মধ্যে স্বত্ব গুণ প্রাধান্য পায় তিনিই "ব্রাহ্মণ" বর্ণের। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪২ নং শ্লোকে ব্রাহ্মণের নয়টি গুণ বর্ননা করেছেন-শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কয়টি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম।

২. আর যাদের মধ্যে স্বত্ব গুণের পরিমাণ কম কিন্তু রজঃ গুণ প্রাধান্য পায় তারা "ক্ষত্রিয়" বর্ণের। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৩ নং শ্লোক অনুসারে শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, দানশীলতা ও শাসন ক্ষমতা

এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম।

৩. যাদের মধ্যে রজঃ গুণের পরিমাণ কম কিন্তু তমোগুণ এর পরিমাণ বেশি তারা বৈশ্য বর্ণের। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৪ নং শ্লোক অনুসারে-কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এই কয়টি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম।

৪. আর যাদের মধ্যে তমোগুণ প্রাধান্য পায় তারা শূদ্র বর্ণের। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৪ নং শ্লোক এর শেষাংশ অর্থাৎ পরিচর্যা হচ্ছে শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম।

বর্তমান সময়ে অর্থাৎ কলি যুগের এই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশিত বাণী অনুযায়ী একই পরিবারের ভিতরে বিভিন্ন বর্ণ বিদ্যমান। একজন সত্ব গুণের অধিকারী তো একজন রজঃ গুণের ধারক আবার অন্যজন তমোগুণের।

তাই আপনি তাদের কোন বর্ণে শ্রেণিভুক্ত করবেন?

শ্রাদ্ধকর্মের জন্য তাদের কতদিনের বিধান প্রযোজ্য?

তাইতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের মঙ্গলের জন্য সঠিক বিধান দিয়ে রেখেছেন গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

যেখানে ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগরুড়কে বলেছেন মনুষ্য মৃত্যুর পর পুত্র ও সপিণ্ডগণের দশোরাত্র অশৌচ পালনীয়।

এখানে কোন বর্ণ বিভাজন করেননি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি জানেন মনুষ্য সমাজ প্রায়শই ভুল করেন স্বভাবজাতভাবে অর্থাৎ প্রকৃতির তিনটি গুণ-সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রভাবে। তাই পূর্বে প্রচলিত অশৌচ বিধি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণের জন্য অশৌচ দিবসসমূহ যথাক্রমে ১০, ১২, ১৫ এবং ৩০ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশনা অনুযায়ী বাতিল হয়ে গিয়েছে।

এখন কলিকালে অশৌচ ও শ্রাদ্ধ পালনের দিবসের বিধান শুধুমাত্র একটাই তা হচ্ছে দশোরাত্র অশৌচ এবং ১১ দিবসে শ্রাদ্ধ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র সপ্তদশ অধ্যায়ের ৫ম ও ষষ্ঠ শ্লোকসমূহঃ

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।।৫
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্।।৬

যার বাংলা অর্থঃ "দম্ভ ও অহংঙ্কারযুক্ত এবং কামনা ও আসক্তির প্রভাবে বলান্বিত হয়ে যে সমস্ত অবিবেকী ব্যক্তিরা তাদের দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহকে এবং অন্তরস্থ পরমাত্মাকে কষ্ট দিয়ে শাস্ত্র বিরুদ্ধ ঘোর তপস্যার অনুষ্ঠান করে তাদের আসুরিক বুদ্ধিবিশিষ্ট বলে জানবে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য "গরুড় পুরাণে"র উত্তর খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে বলেছেন-মনুষ্য মৃত্যুর পর পুত্র ও সপিণ্ডবর্গের দশোরাত্র অশৌচ বিধেয়। অর্থাৎ একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ হবে এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য শাস্ত্রীয় বিধান।

তাই আমরা যারা ১৩ (তেরো) দিন, ১৬ (ষোল) দিন বা ৩১ (একত্রিশ) দিনে শ্রাদ্ধ করছি তারা ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কথিত শাস্ত্র বিরোধী ঘোর তপস্যা করে নিজেদের দেহ এবং দেহের অন্তরস্থ পরমাত্মাকে কষ্ট দিচ্ছি অর্থাৎ প্রকারন্তে সৃষ্টিকর্তাকেই কষ্ট দিচ্ছি।

অন্যদিকে যার মুক্তির জন্য এত কষ্ট করে শ্রাদ্ধ করছি যথাসময়ে সে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করে তাকে (প্রেত আত্মাকে) অহেতুক কষ্ট দিয়ে অতৃপ্ত আত্মার অভিশাপ কুড়াচ্ছি। পুত্র ও সপিণ্ডগণ যথাসময়ে শ্রাদ্ধ করলে মৃত ব্যক্তির আত্মা তার উত্তর সুরীদের ধন ও পুত্র লাভের জন্য যথাযোগ্য আশির্বাদ করে থাকে।

তাই প্রত্যেক সনাতনী ভাইবোনদের আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন, আমরা সকলে শাস্ত্রীয় বিধান জানি, পালন করি এবং সেমত আমাদের সনাতন ধর্মকে উচ্চ-এ স্থাপন করি।।

ইউনিওয়াশ এর পক্ষ থেকে শারদীয় দূর্গা পূজার শুভেচ্ছা
SHINE FORMULA + STAIN CLEANER
uni wash
সিনথেটিক ডিটারজেন্ট পাউডার
ইউনিওয়াশ
ডিটারজেন্ট পাউডার
RSPL
EVOLUTION IS CONSTANT

Panorama Washing Co. Ltd.

A Sister Concern of Panorama Group

শারদীয় শুভেচ্ছা

A Complete Washing House

Kodda Nandun, Nawzor, Gazipur, Bangladesh
Tel: +88-02-9262607, 9262608, Cell: 01711 528 264
E-mail: kabir@panoramawclbd.com

RAJ WASHING PLANT LTD.

শারদীয় দুর্গাপূজার

শুভেচ্ছা

1193, Kamarjuri, sign Board, National University, Gazipur
Phone: 9293184-6, +88-02-9293186
Call: 01552-461107, 01915-490577
E-mail: rajwashing@yahoo.com

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মন

প্রফেসর স্বপন কুমার বনিক

নিতাই চন্দ্র সাহা

ড. রতন চন্দ্র দে

অরুণাভ চক্রবর্তী

প্রণয় কান্তি বিশ্বাস

চন্দন কুমার দে

সঞ্জীব কুমার সাহা

শশাঙ্ক শেখর ভৌমিক

রথীন্দ্র নাথ দত্ত

গৌতম কুমার ঘোষ

আনন্দ মোহন মন্ডল

বাবুল চন্দ্র রায়

অধ্যাপক আরতি দাশ

খোকন কান্তি শর্মা

প্রকৌশলী সনজিত কুমার ঘোষ

বিমল কুমার সাহা

প্রণব সাহা

প্রণব কুমার সাহা

অমলেন্দু রায়

ডাঃ চন্দ্র শেখর বোস

ডাঃ রনধীর কুমার কুণ্ডু

ডাঃ সুশংকর কুমার মন্ডল

বিপ্লব কুমার রায়

সঞ্জয় চ্যাটার্জী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

মহাদেব ঘোষ

সুজিত চ্যাটার্জী

সুবল চন্দ্র রায়

সপ্তম বিশ্বাস, এফসিএ

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

জীবন কৃষ্ণ মোদক

বিপুল কুমার বিশ্বাস

প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার

ইঞ্জি. ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

অনুপ কুমার সাহা

অপূর্ব কুমার রাহুত

বিষ্ণুপদ রায়, এফসিএমএ

গোপাল চন্দ্র দেবনাথ, এফসিএ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

বিপ্লব কুমার সরকার

লিটন কুমার দাস

নিতাই চন্দ্র মণ্ডল

সঞ্জীব কুমার বণিক

ডাঃ মৌসুমী সরকার

চন্দন কুমার সাহা

নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মধু সূদন মন্ডল

বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

অখিল বিশ্বাস

তাপস কুমার সাহা

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

বিশ্বজিৎ কুমার কর্মকার

রমেশ চন্দ্র ঘোষ

রাহুল রাহা

এস. কে. সিকদার

শ্যামল কুমার মুখার্জী

সাত্যকি কবিরাজ

তাপস কুমার দাস

রাজিব দাশ

সুধীর রঞ্জন দাশ

ইঞ্জি. মিহির কান্তি মজুমদার

ডাঃ দেবব্রত হালদার

প্রদীপ কুমার সূত্রধর

কানাই লাল বণিক

স্বাগতম কুমার সাহা

শ্রী দেবল কুমার দাস

nahee
SS PIPE
TIMELESS BEAUTY

পরিবেশ বান্ধব
ক্ষয় ও মরিচা প্রতিরোধক

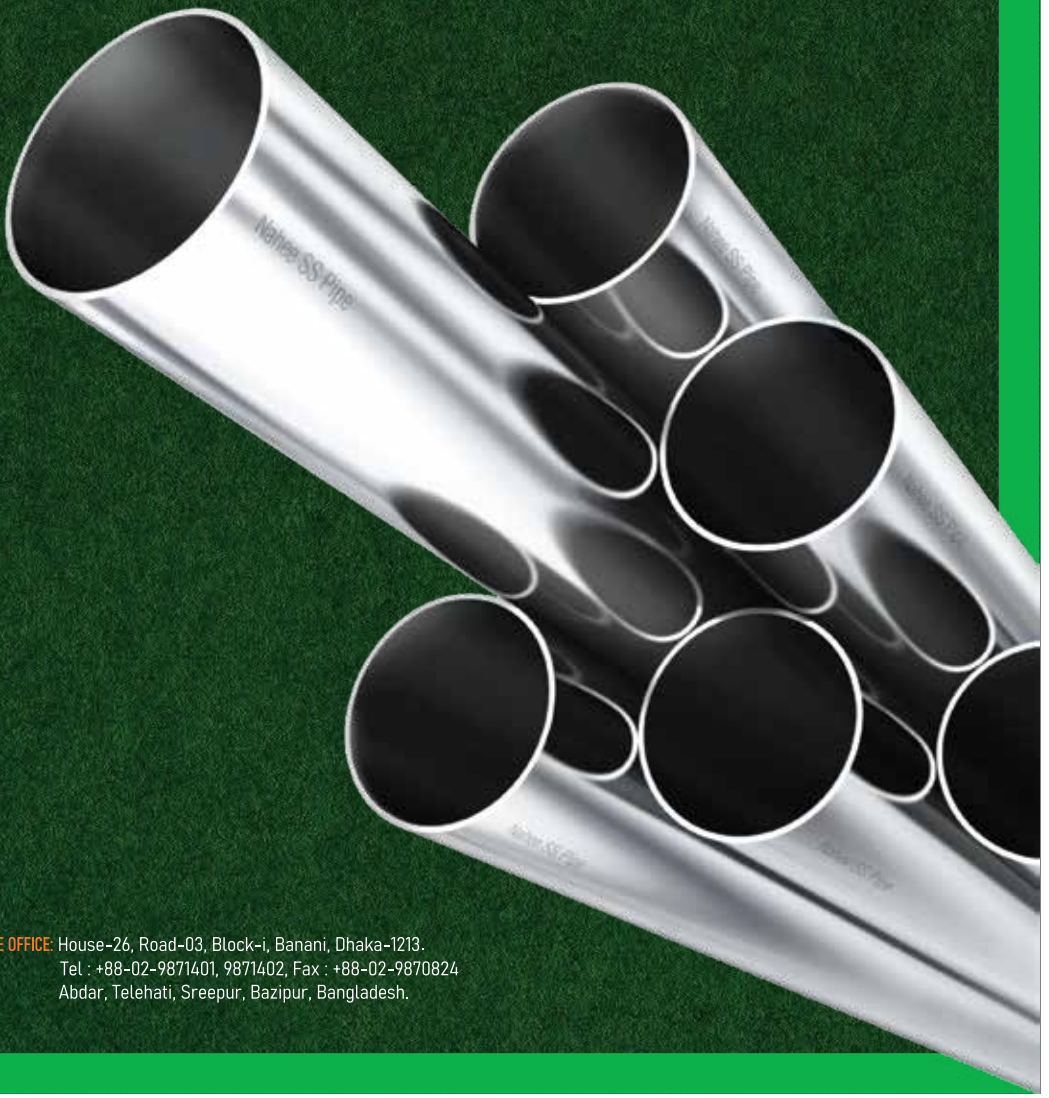

CORPORATE OFFICE: House-26, Road-03, Block-i, Banani, Dhaka-1213.
Tel : +88-02-9871401, 9871402, Fax : +88-02-9870824
FACTORY: Abdar, Telehati, Sreepur, Bazipur, Bangladesh.

POWER GENERATOR FROM
UNITED KINGDOM (U.K)

AJ Power

Diesel generating sets worldwide

Distributor:

EURO PARTS BD LTD.

House-365/4,Road-6 Baridhara DOHS
Dhaka-1206, Bangladesh.
Tel: 880-2-8416323, 8416324
Phone: +880 1711521010,01711596437

Hasan Mahmud
Managing Director

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INTERNATIONAL TRADE 2016

AJ Power Limited
1 Charlestown Drive
Craigavon
BT63 5GA
Northern Ireland
United Kingdom
Telephone +44 (0) 28 3836 1000
Fax +44 (0) 28 3836 1010

Bipul Kanti Das
Chairman

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

প্রদীপ কুমার সাহা
সভাপতি

শান্তনু দাস বাপ্পী
সহ-সভাপতি

সঙ্গীত কুমার ঘোষ
সহ-সভাপতি

প্রমোদ রঞ্জন রায়
সহ-সভাপতি

নেপাল দে
সহ-সভাপতি

ভবেশ গোস্বামী
সহ-সভাপতি

শিশির রঞ্জন দাস
সহ-সভাপতি

দীপক লাল কর্মকার
সহ-সভাপতি

সুখলাল নন্দী
সাধারণ সম্পাদক

অশোক ধর
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

অরুন চন্দ্র ভৌমিক
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

হীরালাল বাইন
অর্থ সম্পাদক

ঝন্টু চন্দ্র সাহা
সহ-অর্থ সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় রায়
সাংগঠনিক সম্পাদক

শ্যামল মিত্র
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

বিশ্বজিত রায়
দপ্তর সম্পাদক

প্রবীর কুমার সরকার
প্রচার সম্পাদক

প্রিয়লাল শর্মা
সহ-প্রচার সম্পাদক

এড. বিনয় কৃষ্ণ পোদ্দার
আইন বিষয়ক সম্পাদক

গোপাল চন্দ্র দত্ত
গণ সংযোগ সম্পাদক

প্রকাশ কুমার দাস
গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক

রতন কুমার রায়
সহ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক

অরুণ চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

প্রদীপ কুমার সাহা
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মানিক লাল দাস
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

কেশব সেন
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

রনধীর বিশ্বাস
ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক

কবিতা রাণী পাল
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

নমিতা চক্রবর্তী
সহ-মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

অসীম কুমার দাশ
ছাত্র, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক

দীপ্তি সাহা
পূজা বিষয়ক সম্পাদক

মিনা ভৌমিক
সহ-পূজা বিষয়ক সম্পাদক

সুবিমল শিকদার
শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

গৌর চন্দ্র ঘোষ
সদস্য

নারায়ন চন্দ্র দে
সদস্য

বকুল রানী দেবী
সদস্য

লিটন চন্দ্র দাস
সদস্য

মিলন কৃষ্ণ দাস
সদস্য

ইঞ্জি. উত্তম কুমার দাস
সদস্য

সনৎ দত্ত
সদস্য

বাবুল চন্দ্র ঘোষ
সদস্য

মিহির মজুমদার
সদস্য

সুভাষ মজুমদার
সদস্য

যদু নাথ ঘোষ
সদস্য

রতন কুমার মজুমদার
সদস্য

অমরেশ চন্দ্র দাস
সদস্য

সুদীপ কুমার ভদ্র
সদস্য

উজ্জ্বল কুমার বৈদ্য
সদস্য

জয়ন্তী রাণী ধর
সদস্য

মিতালী রায় চৌধুরী
সদস্য

মনিকা শর্মা
সদস্য

ভাসমান বেডে চাষ করলে বিষমুক্ত সবজি মেলে।

প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্প এলাকায় শাক সবজি ও মসলা ফসলের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করা এবং পুষ্টিগত অবস্থা কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ উন্নীত করা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মপরিকল্পনা

১. জাতীয় কর্মশালা
২. জাতীয় সেমিনার
৩. পিআইসি মিটিং
৪. কৃষক প্রশিক্ষণ
৫. উপকারভোগী কৃষকদের প্রশিক্ষণ
৬. এসএএও প্রশিক্ষণ
৭. কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ
৮. মাঠ দিবস
৯. কৃষক উদ্বুদ্ধকরন সফর
১০. মসলাজাতীয় ফসলের প্রদর্শনী
১১. লতাজাতীয় সবজির প্রদর্শনী
১২. লতাবিহীন সবজির প্রদর্শনী
১৩. অগ্রগতি মনিটরিং
১৪. মধ্যবর্তী মূল্যায়ণ

ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

বাস্তবায়নে ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

Fire Insurance
Motor Insurance
Marine Insurance
Aviation Insurance
Engineering Insurance
Personal Accident
Overseas Mediclaim
Miscellaneous Insurance
Sena Kalyan Insurance Company Ltd.
Your Trusted Risk Manager

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

কনিকা রানী পাল

গৌরী কর্মকার

স্বর্ণা সেন

মিনি রানী কীর্ত্তনীয়

মিনতি শর্মা

রীতা রায়

মাধবী প্রভা দাস

কনিকা শর্মা

টুম্পা দাস

দুলাল দেবনাথ

নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চন্দন দেবনাথ

সঞ্জয় কুমার দাস

নির্মল কান্তি ওঝা

বিজন বিশ্বাস

রাম প্রাসাদ

জয়শ্রী শর্মা

রনজিৎ কুমার পাল

সমীর চন্দ্র দত্ত

আলোকা রাণী সরকার

চঞ্চল চৌধুরী

বিমল কৃষ্ণ দেব

স্বপন দাস

চঞ্চলা সরকার

পরিমল চন্দ্র পাল

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

রনজিৎ কুমার সরকার

উষা রাণী দত্ত

গোবিন্দ হালদার

বিপুল কান্তি রায়

রতন বিশ্বাস

প্রদীপ কুমার বাড়ৈ

প্রদীপ কুমার সেন

দেবেশ চন্দ্র সরকার

সঞ্জীব মৈত্র

সাগর মজুমদার

তনুশ্রী রাণী পাল

সুপ্রীয়া রাণী সাহা

রতন কুমার মিত্র

ছোটন কুমার দে

সুমন ঘোষ

মৌসুমী রায়

সুমন দে

ভবেশ কুমার শর্মা

নির্মল চন্দ্র নাথ

সঞ্জিত কুমার দেবনাথ

শংকর কর্মকার

প্রণব কুমার রায়

তপন মিত্র

রীতা অধিকারী

বিমল হালদার

ইঞ্জি. সুব্রত দেবনাথ

শিবু কুমার দাস

অসীম কুমার দে

অনন্যা রায় তমা

সুজিত দেবনাথ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

রক্তিম সরকার

রঞ্জিত কুমার নাথ

বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস

রিপন সাহা

দীপক কুমার দাস

প্রদীপ কুমার পাল

গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস

নীতিশ কুমার দাশ

তাপসী ঘোষ

বিউটি রাণী ঘোষ

পরিমল কুমার বিশ্বাস

রাজীব দাশ

শ্যামল কুমার দাস

দেবব্রত চক্রবর্তী

রত্না মোদক

লিপি কর্মকার

সংগীতা রায়

রিতা দেবনাথ

আরতী বসাক

শ্রীমতি পলি বসাক

লিটন কান্তি সুশীল

প্রদীপ কুমার পাল

রূপেন দেবনাথ (লিটন)

সুবর্ণা দাস

নিমাই চন্দ্র দাস

তেজগাঁও মহিলা কলেজ

৭৬, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা- ১২১৫

কলেজ ফোন: ৪৮১১৮৬৮৪, ০১৩০৯১০৮৫৩৬

E-mail: tmcdhaka@gmail.com Web: www.tejgaonmohilacollege.edu.bd

উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান), বিবিএ (প্রফেশনাল) ও মাস্টার্স পাঠ দানকারী কলেজ

অনার্স বিষয়সমূহঃ

বিবিএ (সম্মান):

হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স

বিএসএস (সম্মান):

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি

বিএ (সম্মান): ইংরেজি

বিএসসি (সম্মান):

গণিত, প্রাণিবিদ্যা

mfvcwZ
Avey Avn‡g`

Aa¨vÿ
†gvnv¤§` bRiæj Bmjvg

তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা

১৬ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫,
ফোন ঃ ৪৮১১৩৬২৮, ৪৮১১৭০০৮ মোবাইলঃ ০১৭৯৮১৪৪০৭২
www.tejgaoncollege.edu.bd; e-mail: tejgaoncollege@ymail.com

তেজগাঁও কলেজটি ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেটে অবস্থিত বাংলাদেশর সর্ববৃহৎ বেসরকারী কলেজ হিসেবে ঐতিহ্যের সাথে সূদীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষা কার্যক্রম সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান), বিবিএ, এমবিএ, সিএসই, থিয়েটার এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টসহ ২৮টি বিষয়ে অনার্স ও এমবিএসহ ১৭টি বিষয়ে মাস্টার্স পড়াশোনার সুবিধা রয়েছে।

স্নাতক (সম্মান) কোর্সে বিষয়সমূহ ঃ

বাণিজ্য অনুষদ ঃ হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং ও ব্যবস্থাপনা।

বিজ্ঞান অনুষদ ঃ রসায়ন, প্রাণরসায়ন, পদার্থ, গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান ও ভূগোল।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি।

কলা অনুষদ ঃ বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামিক স্টাডিজ, দর্শন, গার্হস্থ্য অর্থনীতি।

মাস্টার্স ১ম পর্ব ঃ হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ব্যবস্থাপনা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞান।

মাস্টার্স শেষ পর্ব ঃ হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স, বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, গণিত, প্রাণরসায়ন, মনোবিজ্ঞান, রসায়ন, ভূগোল ও পরিবেশ।

তেজগাঁও কলেজ কোড ঃ ৬৪২২, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটের তথ্য ঃ

মানবিক ঃ www.nu-ba.info, বিজ্ঞান ঃ www.nu-bsc.info, ব্যবসায় শিক্ষা ঃ www.nu-bbs.info

অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক
সভাপতি, তেজগাঁও কলেজ পরিচালনা পরিষদ

প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ
অধ্যক্ষ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি

কমল কান্তি রায়
সভাপতি

সুজিত ঘোষ
সহ সভাপতি

বিক্রম চন্দ্র দাস
সহ সভাপতি

রতন কুমার সরকার
সহ সভাপতি

শুভ্রদেব মিত্র
সহ সভাপতি

অনিন্দ রায়
সহ সভাপতি

অশ্রু রায়
সহ সভাপতি

বিনয় শর্মা
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

পার্থ বাড়ৈ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

সাগর ঘোষ
আইন বিষয়ক সম্পাদক

শাওন মিত্র
কোষাধ্যক্ষ

দেবব্রত রায় শুভ
সাংগঠনিক সম্পাদক

দীপ্ত রায়
সাংগঠনিক সম্পাদক

রাহুল চন্দ্র দাস
সাংগঠনিক সম্পাদক

মিহির মন্ডল
দপ্তর সম্পাদক

সমীর রায়
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

মেঘনাথ বিশ্বাস
সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক

সজল দাস
শিশু কিশোর বিষয়ক সম্পাদক

অঞ্জন শর্মা
পুজা ও ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

আশিষ মল্লিক
সদস্য

সুরঞ্জিত গুপ্ত
সদস্য

শ্রাবণ মজুমদার
সদস্য

হৃদয় সরকার
সদস্য

সৌরভ সুর
সদস্য

হৃদয় শর্মা
সদস্য

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি

সাগর মন্ডল
সদস্য

দুর্জয় চন্দ্র দাস
সদস্য

ভাস্কর পান্ডে
সদস্য

বিবেক রায়
সদস্য

মিলন দত্ত
সদস্য

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য

অদ্রি দাশ কথা

প্রিয়াংকা শর্মা

প্রকৃতা বাইন পাপড়ি

তিথি ঋতুপর্ণা দত্ত

অর্পিতা পাল

মিলেনিয়াম রায় পুজা

অদিতি বিশ্বাস

শাশ্বতি বিশ্বাস

অমিত মজুমদার

শিশির মন্ডল

অন্তর চন্দ্র দাস

অসিত মন্ডল

উমেশ চন্দ্র ঘোষ

নিলয় চন্দ্র দাস

সমীরণ কুমার ঘোষ

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য

মনোজ ঘোষ

রাহুল কান্তি সরকার

সৈকত চন্দ্র দাস

অভিজিত রায়

ঝন্টু বাগচী

নরোত্তম মল্লিক

অনুপম পাত্র

নয়ন চন্দ্র দাস

নীহার রঞ্জন বাড়ৈ

রানা চন্দ্র দাস

সজল কুমার বিশ্বাস

শুভ চন্দ্র দাস

অপু দাস

দীপ্ত ঘোষ

দীপঙ্কর হালদার

প্রীতম কৃষ্ণ ঘোষ

অনুপম মন্ডল

পংকজ রায়

প্রসেনজিৎ বর্মন

বিধান বাড়ৈ

অজয়

সবুজ বাড়ৈ

সুবীর বাড়ৈ

নান্টু চন্দ্র দাস

সুদাম চন্দ্র দাস

অনুপ হালদার

স্বপন চন্দ্র দাস

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য

প্রণব বাড়ৈ

অনিক চন্দ্র দাস

প্রীতম বিশ্বাস (দ্বীপ)

পাপিয়া বাইন

দীনবন্ধু বিশ্বাস

সুকৃতি কুমার রায়

জনি চন্দ্র দাস

সাগর কুমার দে

জয়ন্ত মন্ডল

উজ্জ্বল চন্দ্র দাস

মনোজ ঘোষ

উমেশ ঘোষ

রাজীব অধিকারী

প্রমা বালা

প্রিয়াংকা ঘোষ

জয়িতা মিত্র

অনামিকা রাণী ধর

প্রথমা শর্মা

অংকিতা ধর

অনুপম সরকার

প্রদীপ্ত কুমার দেব

সজল চন্দ্র দাস

সখ্য স্বরূপ সাহা

রত্না রর্মন

বলাই চন্দ্র বসাক

জ্যোতিশ কুমার রায়

মিঠুন চক্রবর্তী

সঞ্জিত সূত্রধর

দীপন হাওলাদার

মনোজ মণ্ডল

...being strengthened to meet people's expectation,
support economic development of the country

BAPEX

Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited
(A Company of Petrobangla)
BAPEX BHABON, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215, Phone: 88-02-8189123
E-mail: gmplanning@bapex.com.bd
www.bapex.com.bd

আপনি জানেন কি?

এ বছর সরকার ফসল উৎপাদনে সারের জন্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করছে। কাজেই অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সার ব্যবহার পরিহার করে সাশ্রয়ী হোন। অতিরিক্ত সার ব্যবহার মাটি ও ফসলের জন্য ক্ষতিকর।

অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহারের ফলে

- ফসলে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যায়;
- রোগ-বালাই বেড়ে যায়;
- গাছ হেলে পড়ে;
- ধান ফসলে চিটার পরিমাণ বেড়ে যায়;
- ফসলের গুণগত মান ও বাজার মূল্য কমে যায়;
- ফসলের ফলন কম হয়;
- জমির উর্বরতা শক্তি কমে যায়;
- অর্থের অপচয় হয়;
- পরিবেশের ক্ষতি হয়।

অতিরিক্ত টিএসপি সার ব্যবহারের ফলে

- মাটির অন্যান্য খাদ্য উপাদান যেমন ক্যালসিয়াম, দস্তা, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজের অভাব দেখা দেয়;
- ফসল উৎপাদন কমে যায়;
- অর্থের অপচয় হয়;
- মাটির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

অতিরিক্ত পটাশ সার ব্যবহারের ফলে

- মাটির অন্যান্য খাদ্য উপাদান যেমন ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের অভাব দেখা দেয়;
- ফসল উৎপাদন কমে যায়;
- অর্থের অপচয় হয়;
- মাটির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

কৃষক ভাইদের করণীয়

- সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন;
- কাইচ থোর অবস্থায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন;
- পরিমাণমত ইউরিয়া সার কিস্তিতে প্রয়োগ করুন;
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি সরিয়ে সার প্রয়োগ করুন;
- সার প্রয়োগের পরপরই ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন;
- পাতা ভেজা অবস্থায় সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

বিস্তারিত পরামর্শের জন্য আপনার নিকটবর্তী কৃষি সম্প্রসারণ অফিস বা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর বিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ করুন।

সুষম মাত্রায় সার দিন সোনার ফসল ঘরে নিন

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫

আজকের সঞ্চয় দুর্দিনের বন্ধু

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

মাসিক সঞ্চয় ডিপোজিট (এমএসডি), হাউজিং প্রকল্প, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প, হাসপাতাল প্রকল্প, হোস্টেল প্রকল্প, পরিবহন প্রকল্প, বিশুদ্ধ জল বোতলজাত প্রকল্প, সমবায় বিপণী প্রকল্প, বুটিক শপ প্রকল্প, হোম সার্ভিস প্রকল্প, বৃদ্ধাশ্রম প্রকল্পসহ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজ করা।

- ☛ সদিচ্ছাই সঞ্চয়ে সাহস যোগায়।
- ☛ আজকের সঞ্চয় আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।
- ☛ মিতব্যয়ী হোন, সঞ্চয় করুন।
- ☛ সঞ্চয় করে যে, উন্নতি করে সে।

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ-এ সঞ্চয় করুন, স্বাবলম্বী হোন।

সমিতির মূল লক্ষ্য:

সমিতির সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অত্র প্রতিষ্ঠানটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সদস্যদের আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করে তোলা।

উদ্দেশ্যাবলি:

ক. অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল, নির্যাতিত ও সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সহযোগিতা করা।
খ. সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করে সঞ্চয়মুখী করার মাধ্যমে তাদেরকে পারিবারিকভাবে ও সামাজিকভাবে উন্নত করা।
গ. প্রতিষ্ঠানের তহবিল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।
ঘ. সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্ব স্ব পেশায় প্রতিষ্ঠিত করা।
ঙ. সদস্যদের প্রয়োজনে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা।
চ. বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।
ছ. দরিদ্র ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডায়গনোস্টিক সেন্টার/ক্লিনিক/হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।
জ. সদস্যদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে হাউজিং প্রকল্প চালু করা।
ঝ. সর্বোৎকৃষ্টমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
ঞ. মেধাবী ও অস্বচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা।

সমিতির বর্তমান কার্যক্রম:

সমিতির সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক উন্নতির জন্য

- **ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প:** সমিতির সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ চলমান।
- **সমবায় বিপণী প্রকল্প:** তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও-এ সমবায় বিপণী চালু হয়েছে। এই প্রকল্প পর্যায়ক্রমে ঢাকার সর্বত্র চালু হবে। সমবায় বিপণী তেজগাঁও প্রকল্পে মূলধন/বাজেট ৫০ লক্ষ টাকা। মূলধন সংগ্রহের জন্য সমিতির সদস্যদের কাছে শেয়ার বিক্রি শুরু হয়েছে।
- **বুটিক শপ প্রকল্প:** খুব শীঘ্রই বুটিক শপ প্রকল্পটি মহিলা সদস্যাদের নিয়ে চালু হবে।
- **হাউজিং প্রকল্প:** তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁওসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা, ঢাকার উপশহরে সমিতির সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য সমিতির সদস্যদের মাঝে যৌথ উদ্যোগে জমি ক্রয় করে তাতে এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করে কিস্তি সুবিধার মাধ্যমে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও-এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অপরাজিতা হাউজিং সোসাইটি গঠন করা হয়েছে।
- **হোস্টেল প্রকল্প:** ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য শীঘ্রই হোস্টেল চালু হবে।
- **ডায়গনোস্টিক সেন্টার:** সমিতির সদস্যদের স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটি শীঘ্রই চালু হবে।

সদস্য হওয়ার নিয়মাবলি:

- ➤ সদস্য ভর্তি ফি ১০০ টাকা।
- ➤ মাসিক সঞ্চয় ৩০০ টাকা তবে কেউ ইচ্ছা করলে ৬০০/৯০০/১২০০ টাকা বা আরও অধিক সঞ্চয় করতে পারবেন, জমার আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ পাবেন। ভর্তির সময় ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি থাকে) জমা দিতে হবে।

সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:

ক. যারা রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত নাই কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে দণ্ডপ্রাপ্ত নন।
খ. যারা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে সমবায়ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী।
গ. যারা নিয়মিত ও নির্ধারিত ডিপোজিট/সঞ্চয় প্রদানে সক্ষম।
ঘ. যারা অত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করবেন।
ঙ. ১৮ বছরের উপরের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নারী/পুরুষ। তবে ১৮ বছরের নিচে অর্থাৎ নাবালকের ক্ষেত্রে তার অভিভাবক উক্ত হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন।

ঠিকানা: সবার বাজার ডটকম, ১৫৩ তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫
যোগাযোগ: ০১৭১১ ৯০৫২০৬, ০১৭১১ ৫২৮২২০, ০১৯৭১ ৯৭৪৫৭৯

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যকরী কমিটি

১০, খেলাঘর ক্লাব মার্কেট, তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মণ
সভাপতি

অশোক কুমার ধর
সহ-সভাপতি

সান্তনু দাস
সাধারণ সম্পাদক

কেশব সেন
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় রায় তপন
কোষাধ্যক্ষ

প্রমোদ রঞ্জন রায়
সদস্য

প্রবীর কুমার সরকার
সদস্য

শ্যামল মিত্র
সদস্য

নমিতা চক্রবর্তী
সদস্য

গৌর চন্দ্র ঘোষ
সদস্য

লিটন চন্দ্র দাস
সদস্য

রতন কুমার রায়
সদস্য

উপদেষ্টামণ্ডলী

১. শ্রী রমেশ চন্দ্র ঘোষ
২. শ্রী শ্যামল মুখার্জী
৩. শ্রী তাপস কুমার দাস
৪. শ্রী বিপ্লব কুমার রায়
৫. শ্রী প্রদীপ কুমার সূত্রধর
৬. শ্রী রাহুল রাহা

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
১.	শ্রী শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মন	৩৮.	শ্রী দুলাল দেবনাথ
২.	শ্রী অরুণ চন্দ্র ভৌমিক	৩৯.	শ্রী অপূর্ব কুমার রাহুত
৩.	শ্রী সুখলাল নন্দী	৪০.	শ্রী রনজিৎ কুমার সরকার
৪.	শ্রী প্রিয়লাল শর্মা	৪১.	শ্রীমতি শুক্লা বিষ্ণু
৫.	শ্রী হিরালাল বাইন	৪২.	শ্রী গৌর চন্দ্র ঘোষ
৬.	শ্রী মৃত্যুঞ্জয় রায় (তপন)	৪৩.	শ্রী চঞ্চল চৌধুরী
৭.	শ্রী শিশির রঞ্জন দাস	৪৪.	শ্রীমতি উষা রানী দত্ত
৮.	শ্রী প্রমোদ রঞ্জন রায়	৪৫.	শ্রীমতি নমিতা রায়
৯.	শ্রী নেপাল দে	৪৬.	শ্রী বিমল হালদার
১০.	শ্রী সঞ্জীব মৈত্র	৪৭.	শ্রী গোবিন্দ হালদার
১১.	শ্রী রনধীর বিশ্বাস	৪৮.	শ্রী প্রদীপ কুমার বাড়ৈ
১২.	শ্রী প্রবীর কুমার সরকার	৪৯.	শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা
১৩.	শ্রী প্রদীপ কুমার সাহা	৫০.	শ্রী সনৎ দত্ত
১৪.	শ্রী শ্যামল মিত্র	৫১.	শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
১৫.	শ্রী ভবেশ গোস্বামী	৫২.	শ্রীমতি বীণা রানী দাস
১৬.	শ্রী কেশব সেন	৫৩.	শ্রী বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস
১৭.	শ্রী শ্যামল কুমার দাস	৫৪.	শ্রীমতি চঞ্চলা সরকার
১৮.	শ্রী অশোক কুমার ধর	৫৫.	শ্রীমতি শাশ্বতী বিশ্বাস
১৯.	শ্রী বিশ্বজিৎ চন্দ্র শীল	৫৬.	শ্রীমতি অদিতি বিশ্বাস
২০.	শ্রী সংগীত কুমার ঘোষ	৫৭.	ডা: চন্দ্রশেখর বোস
২১.	শ্রীমতি কবিতা রানী পাল	৫৮.	শ্রী বাবুল চন্দ্র ঘোষ
২২.	শ্রীমতি নমিতা চক্রবর্তী	৫৯.	শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দে
২৩.	শ্রী বিশ্বজিৎ কুমার পাল	৬০.	শ্রী রবীন্দ্রনাথ বর্মন
২৪.	শ্রী সান্তনু দাস বাপ্পী	৬১.	শ্রী রামপ্রসাদ সরকার
২৫.	শ্রী মানিক লাল দাস	৬২.	শ্রী শিবু কুমার দাস
২৬.	শ্রী বিমল কৃষ্ণ দেব	৬৩.	শ্রী প্রকাশ কুমার দাস
২৭.	শ্রী চন্দন দেবনাথ	৬৪.	শ্রী নরেশ চন্দ্র দত্ত
২৮.	শ্রী দীপক লাল কর্মকার	৬৫.	শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার
২৯.	শ্রী মিলন কৃষ্ণ দাস	৬৬.	শ্রী দেবেশ চন্দ্র সরকার
৩০.	শ্রী বিজন কুমার বিশ্বাস	৬৭.	শ্রীমতি অলকা রানী সরকার
৩১.	শ্রী রতন কুমার বিশ্বাস	৬৮.	এ্যাড. বিনয় কৃষ্ণ পোদ্দার
৩২.	শ্রী স্বপন দাস	৬৯.	শ্রী রতন কুমার রায়
৩৩.	শ্রী গোপাল চন্দ্র দেবনাথ	৭০.	শ্রী সুভাষ মজুমদার
৩৪.	শ্রীমতি বকুল রানী দেবী	৭১.	শ্রী সমীর চন্দ্র দত্ত
৩৫.	শ্রী প্রদীপ সেন	৭২.	শ্রী পরিমল চন্দ্র পাল
৩৬.	শ্রী গোপাল চন্দ্র দত্ত	৭৩.	শ্রী অমরেশ চন্দ্র দাস
৩৭.	শ্রী উজ্জ্বল কুমার বৈদ্য	৭৪.	শ্রীমতি মিতালি রায় চৌধুরী

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
৭৫.	শ্রী পরিমল কুমার বিশ্বাস	১১২.	শ্রী খোকন মালাকার
৭৬.	শ্রী ঝন্টু চন্দ্র সাহা	১১৩.	শ্রী প্রদীপ কুমার পাল
৭৭.	শ্রীমতি জয়শ্রী শর্মা	১১৪.	শ্রী অশ্রু রায়
৭৮.	শ্রী অসীম কুমার দাশ	১১৫.	শ্রী পরেশ দেবনাথ
৭৯.	শ্রী সুবিমল সিকদার	১১৬.	শ্রী আশিষ চন্দ্র শর্মা
৮০.	শ্রী উত্তম কুমার দাস	১১৭.	শ্রী শিশির চন্দ্র শর্মা
৮১.	শ্রীমতি টুম্পা দাস	১১৮.	শ্রী প্রবীর চন্দ্র শর্মা
৮২.	শ্রীমতি মিনতি শর্মা	১১৯.	এ্যাড: সাগর কুমার ঘোষ
৮৩.	শ্রী রনজিৎ কুমার পাল	১২০.	শ্রী অরুণ কুমার দে
৮৪.	শ্রী চন্দন কুমার মজুমদার	১২১.	শ্রী অসীম কুমার দে
৮৫.	শ্রীমতি প্রিয়াংকা সরকার	১২২.	শ্রী সুদীপ কুমার ভদ্র
৮৬.	শ্রীমতি রিতা অধিকারী	১২৩.	শ্রী নান্টু চন্দ্র দাস
৮৭.	শ্রী অমর চন্দ্র দত্ত	১২৪.	শ্রী সুমন চন্দ্র দাস
৮৮.	শ্রী জীবন কৃষ্ণ মোদক	১২৫.	শ্রী সজল চন্দ্র দাস
৮৯.	ডা: কল্যাণী রানী দত্ত	১২৬.	শ্রী রতন সরকার
৯০.	শ্রী স্বপন কুমার কুন্ডু	১২৭.	শ্রী বাসুদেব তালুকদার
৯১.	শ্রী চন্দন কুমার সাহা	১২৮.	শ্রীমতি বিউটি রানী দত্ত
৯২.	শ্রী মিনি রানী কীর্ত্তনীয়া	১২৯.	শ্রীমতি সবিতা রানী দাস
৯৩.	শ্রীমতি মনিকা শর্মা	১৩০.	শ্রী সুসেন শর্মা
৯৪.	শ্রী খোকন শর্মা	১৩১.	শ্রীমতি পলি রানী শর্মা
৯৫.	শ্রীমতি কণিকা শর্মা	১৩২.	শ্রী গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস
৯৬.	শ্রী বিষ্ণু কুমার রায়	১৩৩.	শ্রী অনিল কৃষ্ণ বিশ্বাস
৯৭.	শ্রী রণজিত কর্মকার	১৩৪.	শ্রী শচীন্দ্র কুমার সরকার
৯৮.	শ্রী সঞ্জয় বিশ্বাস (ডন)	১৩৫.	শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস
৯৯.	শ্রী সবুজ দাস	১৩৬.	শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস
১০০.	শ্রী বিক্রম চন্দ্র দাস	১৩৭.	শ্রীমতি দেবশ্রী দাস
১০১.	শ্রী সুকৃতি কুমার রায়	১৩৮.	শ্রীমতি ঝর্ণা রানী পাল
১০২.	শ্রীমতি নিপা গাইন	১৩৯.	শ্রী মিহির মজুমদার
১০৩.	শ্রীমতি অমৃতা রায় জুঁই	১৪০.	শ্রী দীপংকর পাল
১০৪.	শ্রীমতি অর্থী রায় জবা	১৪১.	শ্রী হৃদয় চন্দ্র দাস
১০৫.	শ্রী রাহুল কান্তি সরকার	১৪২.	শ্রী দীনেশ চন্দ্র দাস
১০৬.	শ্রীমতি মনিকা রানী দাস	১৪৩.	শ্রী উত্তম চন্দ্র দাস
১০৭.	শ্রী সৈকত মজুমদার (সাগর)	১৪৪.	শ্রী মনোজ মন্ডল
১০৮.	শ্রীমতি সবিতা রানী মন্ডল	১৪৫.	শ্রীমতি নীলা রানী রায়
১০৯.	শ্রী স্বপন মজুমদার	১৪৬.	শ্রীমতি অদিতি দত্ত
১১০.	শ্রীমতি বন্দনা রানী মজুমদার	১৪৭.	শ্রীমতি আরতি দাশ পোদ্দার
১১১.	ড. নিখিল চন্দ্র সরকার	১৪৮.	শ্রীমতি অনন্যা রায়

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
১৪৯.	শ্রী রত্নেশ্বর দাস	১৮৭.	শ্রী পরেশ নাথ বর্মন
১৫০.	শ্রীমতি তাপসী দাস	১৮৮.	শ্রী জিতেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস
১৫১.	শ্রী সঞ্জিব কুমার দাস	১৮৯.	শ্রী মিহির মন্ডল
১৫২.	শ্রীমতি ইলা রাণী সরকার	১৯০.	শ্রী অনিমেষ সাহা
১৫৩.	শ্রী বিশ্বনাথ দত্ত	১৯১.	শ্রী ক্ষীতিশ চন্দ্র রায়
১৫৪.	শ্রী বিভোর চন্দ্র দাস	১৯২.	শ্রীমতি কনিকা রায়
১৫৫.	শ্রী নির্মল চন্দ্র হাওলাদার	১৯৩.	শ্রী অর্জ্জুন কুমার রায়
১৫৬.	শ্রী অজয় মিত্র	১৯৪.	শ্রী প্রীতম কৃষ্ণ ঘোষ
১৫৭.	শ্রী শেখর দাস	১৯৫.	শ্রী রঘুনাথ বাড়ৈ
১৫৮.	শ্রীমতি রীতা রাণী বর্মন	১৯৬.	শ্রী আনন্দ কুমার মজুমদার
১৫৯.	শ্রী প্রসেনজিৎ বর্মন	১৯৭.	শ্রীমতি মৌসুমী মজুমদার
১৬০.	শ্রী বলাই চন্দ্র উড়াও	১৯৮.	শ্রী রিংকু করিবাজ রাহুল
১৬১.	শ্রী ছোটন কুমার দে	১৯৯.	শ্রীমতি সুপ্রিয়া রাণী সাহা
১৬২.	শ্রী নিহার রঞ্জন মজুমদার	২০০.	শ্রী নিমাই চন্দ্র দাস
১৬৩.	শ্রীমতি শ্যামলী রানী দাস	২০১.	শ্রীমতি লিপি রাণী রায়
১৬৪.	শ্রী সমীর চন্দ্র সেন	২০২.	শ্রী মাঞ্জীর কুমার দাস
১৬৫.	শ্রীমতি শিপ্রা রানী পাল	২০৩.	শ্রী মৃনাল কান্তি বর্মন
১৬৬.	শ্রী উত্তম কুমার দত্ত	২০৪.	শ্রী নির্মল চন্দ্র ঘোষ
১৬৭.	শ্রীমতি প্রিয়াংকা দত্ত	২০৫.	শ্রী পরিতোষ বর্মন
১৬৮.	শ্রী বিমল চৌধুরী	২০৬.	শ্রী কমল কান্তি রায়
১৬৯.	শ্রী চিরঞ্জীৎ গোস্বামী	২০৭.	শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস
১৭০.	শ্রীমতি আরতি বসাক	২০৮.	শ্রীমতি সীমা রাণী দেবনাথ
১৭১.	শ্রীমতি পলি বসাক	২০৯.	শ্রী মানব কুমার দাস
১৭২.	শ্রীমতি প্রতিমা বসাক	২১০.	শ্রীমতি সুনিতী হালদার
১৭৩.	শ্রী বিপুল চন্দ্র বার	২১১.	শ্রী জীবিতেশ্বর রায় জীবন
১৭৪.	শ্রীমতি মনিকা রানী বার	২১২.	শ্রী জ্যোতিশ চন্দ্র
১৭৫.	শ্রী এমএম দাস রঞ্জন	২১৩.	শ্রী জুয়েল ধর
১৭৬.	শ্রীমতি রীতা দেবী	২১৪.	শ্রী রতন কুমার সাহা
১৭৭.	শ্রী রিপন সাহা	২১৫.	শ্রী প্রদীপ কুমার সাহা
১৭৮.	শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	২১৬.	শ্রী গোপীনাথ নাগ
১৭৯.	শ্রীমতি জয়ন্তী রাণী ধর	২১৭.	শ্রীমতি লিলি বিশ্বাস
১৮০.	শ্রী রাতুল দাস	২১৮.	শ্রীমতি দীপ্তি সাহা
১৮১.	শ্রী রাহুল দাস	২১৯.	শ্রী দোলন কান্তি দত্ত
১৮২.	শ্রী জয়ন্ত ঘরামী	২২০.	শ্রীমতি মিনা ভৌমিক
১৮৩.	শ্রীমতি মাধবী সরকার	২২১.	শ্রী সুভাশ চন্দ্র দাস
১৮৪.	শ্রীমতি বিউটি রানী দাস	২২২.	শ্রী যদুনাথ ঘোষ
১৮৫.	শ্রীমতি প্রণতি চক্রবর্তী	২২৩.	শ্রীমতি পম্পা দে
১৮৬.	শ্রীমতি মমতা সরকার		

JMI GROUP

... your trusted partner
in health & service sector

Subsidiaries & Joint Ventures

- JMI Syringes & Medical Devices Ltd.
- JMI Hospital Requisite Mfg. Ltd.
- JMI Marketing Limited
- JMI Vaccine Ltd.
- JMI Printing & Packaging Ltd.
- JMI Builders & Construction Ltd.
- JMI Export Import Co. Ltd.
- JMI Engineering Ltd.
- JMI Industrial Research & Toxicology Ltd.
- JMI Industrial Gas Ltd.
- JMI LPG Petroleum Ltd.
- JMI Sonlu Appliance Ltd.
- JMI Cylinders Ltd.
- JMI Sankur Auto Tank Ltd.
- JMI Sankur Valve & Bung Ltd.
- JMI CNG Dispensing Co. Ltd.
- JMI Safe Transportation Ltd.
- NIPRO JMI Pharma Ltd.
- NIPRO JMI Company Ltd.
- NIPRO JMI Dialysis Centre Ltd.

JMI Group

Corporate Office : Unique Heights, (Level-11), 117, Kazi Nazrul Islam Avenue, Ramna, Dhaka-1217, **Tel:** +88-02-55138723-24, **Fax:** +88-02-55138725
Registered Office : 7/A, Shantibag, Dhaka-1217, Bangladesh, **Tel:** +88-02-48318375, 9333102
Email: info@jmigroup-bd.com, **Web:** www.jmigroup-bd.com

লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ ০১ মার্চ ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প এলাকাঃ দেশের ৭ টি বিভাগের ৩০ টি জেলার ১২৩ টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- লেবু জাতীয় ফল চাষ নিবিড়করণ ও প্রায় ১০-১৫% ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত ৪০,০০০ মে.টন মাল্টা ও কমলা উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়।
- মাল্টা ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের এলাকায় বাইরের ২৫% কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।
- প্রকল্প এলাকার ২০টি সরকারী নার্সারীতে লেবু জাতীয় ফলের মার্তৃবাগান স্থাপন ও চারা উৎপাদনের দক্ষতা প্রায় ২৫% বৃদ্ধি করা।
- প্রদর্শনীভুক্ত কৃষকদের বিশেষ করে মহিলা কৃষকদের সহ অন্যান্য কৃষকদের আয় ১০% বৃদ্ধি করা ও ৮-১০% বেকারত্ব দূর করা।
- সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট ও কমলা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৫০০০টি পুরাতন বাগানের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলন ১৫-২০% বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ✓ লেবু জাতীয় ফসলের (মাল্টা, কমলা, বাতাবী লেবু ও লেবু) একক/মিশ্র প্রদর্শণী
- ✓ পুরাতন লেবু জাতীয় ফল বাগান পরিচর্যা
- ✓ নার্সারী ব্যবস্থাপনা, চারা উৎপাদন ও উন্নয়ন
- ✓ অফিসার ও কৃষক প্রশিক্ষণ
- ✓ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন ও মাঠ দিবস
- ✓ জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মশালা

কৃষিই সমৃদ্ধি

জাতীয় কৃষি গবেষনা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয় করে উন্নত জাত, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় সরকারের কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করে। কাউন্সিলের সাম্প্রতিক উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্যসমূহ নিম্নরূপ:

- জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কৃষি গবেষণায় নীতি-নির্ধারণের জন্য গবেষণা অগ্রাধিকার ও ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ প্রণয়ন
- মাটি, জলবায়ু ও এলাকা উপযোগী ফসল নির্বাচন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের বিজ্ঞানীদের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ এর জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৫ প্রণয়ন
- জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোডম্যাপ ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণয়ন।
- বিএআরসি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির মাধ্যমে বিগত ১০ বছরে এনএআরএস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৭০ টিরও বেশি জাত ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছে।
- ফসলের সারের মাত্রা সুপারিশ করে সার সুপারিশমালা হাতবই-২০১৮ বাংলা ও ইংরেজীতে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনলাইন সেবা হিসেবে বিএআরসি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে।
- জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প-১ এর মাধ্যমে ২০০৭-২০১৪ মেয়াদে এনএআরএস প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দেশে ৭৮টি ও বিদেশে ৩০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ৫০টিরও অধিক নতুন জাত ও উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।
- জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প-২ প্রকল্পটি ২০১৫-২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর থেকে ১৯০টি Competitive Research Grants ও ৫১টি Program Based Research Grants উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় এনএআরএস প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দেশে ৮০টি ও বিদেশে ৬০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে।
- বাংলাদেশের ব্লু ইকোনোমি প্রসারে সামুদ্রিক শৈবাল কৃত্রিমভাবে চাষাবাদ করার লক্ষ্যে বিএআরসি'র সমন্বয়ে ২০১৬ সাল হতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে সহোযোগিতামূলক কর্মকান্ড জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ, বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সংস্থার সাথে ৪০টির অধিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
নূতন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
ফোন: +৮৮০-২-৯১৩৫৫৮৭, +৮৮০-২-৯১১০৮৪২;
ই-মেইল: ec-barc@barc.gov.bd, info@barc.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় জেলার কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা, কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং পুষ্টি ও সামাজিক ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন।

- পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসল আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা ৫%-১০% বৃদ্ধি করা।
- কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমে মহিলাদের ৩০% থেকে ৩৫% সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- মাঠ পর্যায়ে কার্যকরী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য কৃষি কর্মী ও কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

আঞ্চলিক কর্মশালা

খেসারী প্রদর্শনী

জৈব কৃষি প্রদর্শনী।

তালের চারা বিতরণ ।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর জেলার ৪২টি উপজেলায় তাপ/লবনাক্ততা সহনশীল ও আধুনিক জাতের ধান, গম, ভূট্টা, বার্লি, ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসল, তরমুজ, সবজি, সর্জন পদ্ধতিতে সবজিচাষ, আইলে সবজি, জৈব কৃষি ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনার সর্বমোট ৩৬,১৪০টি প্রদর্শনী প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্প এলাকায় ২০,০০০টি তালগাছের চারা, ২০,০০০টি খেজুর গাছের চারা এবং ১০,০০০টি সজিনার চারা রোপন করা হবে। মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য ২,১০০টি কম্পোষ্ট এবং ২,১০০টি ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী স্থাপন করা হবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের-
রুপকল্প (Vision) : সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ
অভিলক্ষ্য (Mission) : প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মধ্যেমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ

- বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিগত ১২ বছরে দুধের উৎপাদন প্রায় ৪ গুণের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে
- মাংসের উৎপাদন প্রায় ৬ গুণ এবং ডিমের উৎপাদন প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে
- মাথা পিছু প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের হারও কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার খামারীর মাঝে ৬৯৯ কোটি টাকা প্রণোদনা হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে
- বর্তমানে মাংস উৎপাদন ৮৪.৪০ লক্ষ মে.টন, দুধ উৎপাদন ১১৯.৮৫ লক্ষ মে.টন এবং ডিম উৎপাদন ২০৫৭.৬৪ কোটি পিছ। বর্তমানে আমরা মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

SQ CABLES

Speaks Safety & Quality

SKIN COATED CABLES

Our Quality Assures Safety.

A Concern Of SQ GROUP
Total Power Solution

+88 01755-661166 info@sqgroupbd.com www.sqgroupbd.com

TVS RAIDER
THE WICKED RIDE
TVS
শারদীয় শুভেচ্ছা
RAIDER
TVS
MONOSHOCK SUSPENSION
ANIMALISTIC HEADLAMP
ADVANCE 3V ENGINE
REVERSE LCD SPEEDOMETER
UNDER SEAT STORAGE
ISG (INTEGRATED STARTER GENERATOR TECHNOLOGY)
01919194222, 01919189111
www.tvsabl.com
TVS Bangladesh

city bank™
AMERICAN EXPRESS
EXPERIENCE
THE NEW GATEWAY
City Bank proudly presents the brand new City Bank American Express® Lounge at the Domestic Terminal, Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, designed to enrich your traveling experience with the utmost comfort. Enjoy gourmet cuisines from InterContinental Dhaka and experience luxury while traveling because your comfort is always our priority. All you need is to have an American Express® Platinum or Gold Credit Card.
Bigger | Better | Cozier
AMERICAN EXPRESS
DON'T
live life
WITHOUT IT™
To know more, please call 16234